শিক্ষিতা

পতিতার আত্ম-চরিত

কুমারী—শ্রীমতী মানদা দেবী প্রণীত

চতুর্থ সংস্করণ

দেড় টাকা।

Publisher—
R. CHAKRAVARTTY
Kumaruli.
Mymensingh.

প্রথম সংস্করণ—আশ্বিন—১৩৩৬
দ্বিতীয় সংস্করণ—কার্ত্তিক—১৩৩৬
তৃতীয় সংস্করণ—অগ্রহায়ণ—১৩৩৬
চতুর্থ সংস্করণ—পৌষ———১৩৩৬

হিন্দি সংস্করণ—১॥০
ইংরেজী সংস্করণ—২৲

PRINTER—
S. DAS
SINGHA PRINTING WORKS.
34-1B, Badur Bagan Street, Calcutta.

আমার কৈফিয়ৎ

পুস্তকের নাম দেখিয়া অনেকেই হয়ত মনে করিবেন যে এই প্রকার জীবনী লিখিবার উদ্দেশ্য কি! মহৎ জীবনীর উদ্দেশ্য মহৎ হইলেও তাহা সমাজের পূর্ণ চিত্র নহে। আমার জীবন মোটেই মহৎ নহে, অধিকন্তু ঠিক তাহার বিপরীত; কিন্তু পুস্তকের উদ্দেশ্য মহৎ। আমি পাপী, কলঙ্কিনী, যশের প্রার্থী নহি—সুতরাং আমার জীবনের খাঁটি কথাগুলি আমি যেমন অকপটে বলিতে পারিব, কোন মহৎই তাঁহার জীবনের ঘটনা তেমন অকপটে বলেন নাই। বলিতে পারেন না। পাপের স্বরূপ চিনিয়া রাখা প্রয়োজন। পাপ জিনিষটা যে কি কৈশোরে তাহা বুঝিতে পারি নাই বলিয়াই আজ আমি—আমি কেন—আমার মত সহস্র সহস্র নারী পতিতা।

বারবনিতা-জীবনে যে দুঃখ কষ্ট এবং অনুতাপ ভোগ করিয়াছি তাহারই স্মৃতি লইয়া এই পুস্তক রচিত হইয়াছে। যাঁহারা আমাদের জীবনকে সুখময় মনে করেন—আমাদের সংস্পর্শে আসিতে আগ্রহান্বিত তাঁহারা বুঝিবেন এ পৃথিবীতে যদি নরক থাকে তবে তাহা আমাদের জীবন।

আমি সমাজের ঘৃণীতা, অস্পৃশ্যা—সমাজে আমার স্থান নাই, স্থান থাকাও উচিত নহে, কিন্তু যে সকল সাধু-বেশী লম্পট আমাদের সংস্পর্শে থাকিয়াও সমাজের উচ্চস্থান অধিকার করিয়া আছেন, আমার জীবনীতে তাহাদেরও কতিপয় চিত্র দেখিয়া সমাজটাকে চিনিয়া রাখিতে পারিবেন। এই ভণ্ডের দল কি প্রকারে অবোধ বালিকার সর্ব্বনাশ করে, তাহার চিত্র দেখিয়া স্তম্ভিত হইবেন।

• আমার এই আত্ম জীবনীতে ৺শিবনাথ শাস্ত্রী, ৺স্যার সুরেন্দ্র নাথ, ৺দেশবন্ধু দাশ, ৺ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী, ৺অশ্বিনীকুমার দত্ত, পূজনীয়া

শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবী, সন্তোষ কুমারী গুপ্তা, উর্ম্মিলা দেবী, স্থনিতী দেবী, মোহিনী দেবী, সরলা দেবী, হেমপ্রভা মজুমদার, বগলা সোম, লেডী অবলা বস্থ, কামিনী রায়, জ্যোতির্ম্ময়ী গাঙ্গুলী, মিসেস্ বি, এল, চৌধুরী, রমলা গুপ্তা, লীলাবতী দাশ,

শ্রীযুক্ত হেরম্ব চন্দ্র মৈত্র, কৃষ্ণকুমার মিত্র, মহেশচন্দ্র আতর্থী; কাজি নজরুল ইছলাম ও তৎপত্নী, মতিলাল নেহরু ও তৎকন্যা এবং সৈয়দ হুসেন, কুমার গোপীকারমণ রায়, রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, আক্রাম খাঁ, আবদুল রহিম, ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ, আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, বীরেন শাসমল, জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমন্ত সরকার, প্রতাপ গুহরায়,

৺বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায়, ৺অমৃতলাল বস্থ, দীনবন্ধু মিত্র, দ্বিজেন্দ্র লাল, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ নরেশ চন্দ্র সেনগুপ্ত,

স্বামী সত্যানন্দ, স্বামী বিশ্বানন্দ, স্বামী সচ্চিদানন্দ, তারকেশ্বরের মোহান্ত প্রভৃতি মহোদয় ও মহোদয়ার নাম প্রয়োজন বশতঃ উল্লিখিত হইয়াছে। আমার মত নূতন লেখিকার অক্ষমতার দোষে যদি তাঁহাদের স্থনামের কোন হানি হইয়া থাকে এজন্য তাঁহাদের প্রত্যেকের নিকট এবং মৃত ব্যক্তিদিগের আত্মার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

এই জীবনীতে আমার ফটো চিত্র দিতে ইচ্ছা করিয়া বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু আমার ভূতপূর্ব্ব শিক্ষক মুকুলচন্দ্র বানার্জ্জি, উকিল মহাশয়ের বিশেষ অনুরোধে তাহা দেওয়া হইল না।

বিনিতা
শ্রীমতী মানদা দেবী

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন

বিশ্বনাথের কৃপায় কয়েক দিনের মধ্যে পুস্তকের দ্বিতীয়বার মুদ্রনের প্রয়োজন হইল। এই সংস্করণে সামান্য পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন হইয়াছে।

আমার এই জীবনীতে ইঞ্জিনীয়ার কন্যা সুরুচীর সম্বন্ধে কয়েকটি কথা আছে। সুরুচীর ভ্রাতা এজন্য পুস্তকের প্রকাশক এবং আমার বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ আনয়নের উদ্দেশ্যে, উকিল দ্বারা এক নোটীশ দিয়াছেন। নোটীশে বলা হইয়াছে—"সুরুচী পতিতা নহে, সে আমার বাড়ী যাইত না, আমি ভদ্রলোকের কন্যা জানিয়া গৃহস্থ হইয়াও সে আমাকে তাহাব বাড়ীতে যাইয়া তাহার সঙ্গে মিশিবার সুযোগ দিয়াছিল। সুরুচী কৃষ্ণকুমার বাবুর জামাতার ঘড়ি চুরি করে নাই ইত্যাদি ইত্যাদি।"

নোটীশের কোন জবাব আমি দেই নাই এবং দিব না, মোকদ্দমার প্রতীক্ষায় রহিলাম, যদি মোকদ্দমা হয় তবে পতিতা সমাজের এমন ঘটনা বাহির হইবে যাহাতে দেশের মঙ্গল হইতে পারে।

আমার এই জীবনী আমার নিজের লেখা কি অন্য পুরুষের লেখা, তাহা লইয়া একদল লোক মাথা ঘামাইতেছেন শুনিতেছি। নারী সম্বন্ধে পুরুষের নানা প্রকার হীন ধারণার জন্যই নারী আজ বিশ্বে সমানাধিকার দাবী না করিয়া পারিতেছেন না। যদি তাঁহারা কেবল ইহাই ভাবিয়া থাকেন যে—পতিতার কি বই লিখিবার ক্ষমতা আছে—ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে—পতিতগণ যদি বই লিখিতে বা পত্রিকা সম্পাদন করিতে পারেন, তবে পতিতাগণ পারিবে না কেন? বিশেষতঃ পতিতা-গণের লিখিত পুস্তকের যথেষ্ট আদর আছে শুনিতে পাওয়া যায়।

প্রতিভার পরিমাপ বিশ্ব বিদ্যালয়ের ডিগ্রি দ্বারা হয় না। পূজনীয়া শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী, নিরুপমা দেবীর কোন ডিগ্রি নাই, ইহারা হিন্দু ঘরের সেকেলে মেয়ে, রিয়েলিষ্টিক্ আর্টেরও কোন ধার ধারেন না, কিন্তু ইঁহাদের লেখনী হইতে যেমন লেখা বাহির হইয়াছে এ পর্য্যন্ত কোন

উপাধিধারিনী তেমন সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর পুস্তক যে লিখিতে পারেন নাই ; তাহা সর্ব্ববাদী সম্মত।

"ভোটে পতিতার স্থান" নামক একটি অধ্যায় এই পুস্তকের জন্য লিখিত হইয়াছিল কিন্তু তাহা কোন বিশিষ্ট রাজনৈতিকের মতামত গ্রহণ না করিতে পারায় এবারেও মুদ্রিত হইল না। * * *

আমার জীবনীতে যাঁহাদের প্রতি সামান্য ইঙ্গিত আছে তাঁহাদের নিকট আমি ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। কাহারও প্রাণে ব্যাথা দিবার জন্য এ পুস্তক লিখিত হয় নাই। বর্ত্তমান সমাজের খাঁটি চিত্র দেখাইয়া সমাজপতিগণের মনোযোগ আকর্ষণই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য। আমার পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে—সমাজে সাড়া পরিয়াছে।

নারী পতিতা হইলে তাহার নাকি কোন মূল্যই থাকে না। তাহাকে অপমান করিলেও আইন অনুসারে "মান হানীর" দাবী চলে না, কিন্তু "পতিত" পুরুষের বেলায় এই আইনই কার্য্যকারী—কারণ, আইন প্রণেতা পুরুষ। আমার উকিল বলেন—আইনের এই ত্রুটির জন্যই, সুরুচী পতিতা নহে—এই মিথ্যা কথা বলিতে বাধ্য হইয়াছে। কংগ্রেস কাউন্সিলে যাঁহারা নারী পুরুষের সমানাধিকার দাবী করেন তাঁহারা কি আইন সভায় ইহার প্রতিকার প্রার্থী হইতে পারেন না? প্রকাশ্যে পতিতাদের প্রতি সহানুভূতি দেখাইলে নিন্দার কোন নূতন কারণ উপস্থিত হইবে না। কারণ কংগ্রেস ও কাউন্সিলের এই সকল মার্কামারা সদস্যদিগকে দেশের লোক ভাল করিয়াই জানে। যদি আগামী কংগ্রেস ও কাউন্সিলে আমাদের এই দাবী কেহ উপস্থিত না করেন তবে মনে করিব যাহারা সমানাধিকারের জন্য চিৎকার করেন তাঁহারা নিছক মিথ্যাবাদী। হয় আমাদের দাবী পূরণ কর—না হয় 'পতিত' দিগকে ও কংগ্রেস কাউন্সিল অথবা অন্য কোন কার্য্য হইতে বহিষ্কৃত করিবার জন্য আইন কর।

চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকা

অযাচিত অনুকূল ও প্রতিকূল সমালোচনার ফলে একমাস মধ্যে তৃতীয় সংস্করণের চারি হাজার পুস্তক নিঃশেষিত হওয়ায় চতুর্থ সংস্করণ মুদ্রিত হইল। এ সংস্করণেও সামান্য পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

কয়েকটী সুনীতিবাদী কাগজ এই পুস্তকে অশ্লীলতার গন্ধ পাইয়াছেন এবং তদনুরূপ সমালোচনাও করিয়াছেন; পক্ষান্তরে দেশ বরেণ্য ও শ্রদ্ধেয় বহু সমাজনেতা ও সাহিত্য-রথী এই পুস্তক সম্বন্ধে উক্ত সুনীতি-বাদিগণের বিরুদ্ধ মত সমালোচনা করিয়াছেন ও আমাদিগকে জানাইয়াছেন। তাহা হইতে কয়েকখানি পুস্তকের সঙ্গে মুদ্রিত হইল।

প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় পুস্তক সম্বন্ধে লিখিয়াছেন "জননীর স্তন হইতে শিশু দুগ্ধই গ্রহণ করে কিন্তু জলৌকা বা জোঁক সেই স্তন হইতেই রুধির ভিন্ন আর কিছুই বাহির করিতে পারে না।"

উপরোক্ত সুনীতি বাগীশদিগের সম্বন্ধে আমাকে কয়েকটী কথা বলিতে হইতেছে।

"ছোট বউর বাঁট দুখানির আস্বাদন" যে খবরের কাগজ ভদ্রসমাজে পরিবেশন করিয়াছেন এবং যে শ্রেণীর সাধুবেশী লম্পট এবং 'ম' কারের উপাসক নারীকে প্রগতি প্রাপ্তা করাইতে অঙ্গহীন হইয়াছেন তাঁহারাই মাত্র গন্ধ পাইয়াছেন। দুঃখ হয় এই ভাবিয়া যে এঁরা বিশ্ব-সাহিত্য ত দূরের কথা সংস্কৃত কুমারসম্ভব খানিও যেন পড়েন নাই। পড়িলে 'কুমার সম্ভব' আজ বি, এ, ক্লাসের পাঠ্যতালিকায় স্থান না পাইয়া ইহাদের মানবহিতকর উপদেশে গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক 'প্রোস্ক্রাইবড্' পুস্তক শ্রেণীর অঙ্গীভূত হইত।

ছাগ মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের অত্যুগ্র পলাণ্ডু গন্ধী গো-শূকর মাংস যে সকল সাহিত্যরথিগণের অনায়াসে হজম হইয়াছে হরিণ মাংসে তাঁহাদের সহসা এবম্প্রকার অরুচি কি করিয়া সম্ভব হইল তৎসম্বন্ধে কোন লব্ধপ্রতিষ্ঠ কাগজ লিখিয়াছেন...পুস্তকে অনেক অপ্রিয় সত্য আলোচিত হইয়াছে।...

যাঁহাদের হাঁড়ি আজিও হাটে ফাটে নাই, তাঁহারাও বুঝিবা এই ফাটে ভয়ে চিৎকার করিতেছেন।"

সুরুচির একনিষ্ঠ উপাসক, লব্ধপ্রতিষ্ঠ কোন এক মাসিকের পৌষ সংখ্যায় শ্লীলতার পরাকাষ্ঠার এক চিত্র বাহির হইয়াছে। উহাতে আছে তিন জোড়া যুবতীর স্তনের ছড়াছড়ি মাত্র। সুরুচি বাগীশ সম্পাদক মহাশয় শ্লীলতার মাপ কাঠি খানি কোথায় লাভ করিয়াছেন জানিতে কৌতুহল হয়। ইতিহাসের দোহাই দিয়া হয়ত সম্পাদক মহাশয় আত্মরক্ষা করিতে চাহিবেন; কিন্তু চিত্রে ইতিহাস টিকিবে কি?

রাজা ও নহেন ঋষিও নহেন এমন কোন ৺সমাজ সংস্কারক (?) যৎকালে যবন উপপত্নীর সঙ্গে উভয়ে উলঙ্গ অবস্থায় মদ্য পানে রত, ইহাদের তৎকালীন চিত্র সম্ভবতঃ উপরি উক্ত সম্পাদক মহাশয়ের চক্ষে অশ্লীল দেখাইবে; কিন্তু কেহ ত আজি পর্য্যন্ত তৎসম্বন্ধে কোন চিত্র প্রকাশ করিয়া ঐতিহাসিক তত্ত্ব আবিষ্কার অথবা রুচি জ্ঞানের পরিচয় দেন নাই।

যে সমাজের সিদ্ধ মহাপুরুষকে এরূপ অবমাননাকর চিত্রে অঙ্কিত করা হইয়াছে বাঙ্গালায় তাঁহাদের লোক সংখ্যা অতি নগণ্য। নতুবা এই স্পর্দ্ধা সম্ভব হইত কি? পতিতার পক্ষেও কথা বলিবার কেহ নাই বলিয়াই কি সুরুচিবাগীশের দল অমন লম্বা চওড়া স্পীচ্ ঝাড়িতে সুরু করিয়াছেন? এ চাল বাজিতে দেশের লোক আর ভুলিবে বলিয়া মনে হইতেছে না।

দৈনিক বঙ্গবাণী ইঙ্গিত করিয়াছেন যে পণ্ডিত শ্যাম সুন্দর চক্রবর্ত্তী এই পুস্তকের লেখক এবং মনস্বী জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় পুস্তকের লভ্যাংশ পাইয়া থাকেন। পতিতা সমাজে যদি ইচ্ছাপূর্ব্বক কাহারও উপর মিথ্যা দোষারোপ ক'রে—তাহার বিচার হয় সম্মার্জ্জনী দ্বারা—এই লেখক মহাশয় "পতিত" কিনা না জানায় তাঁহাদের দলপতির উপর এই মিথ্যা উক্তির বিচারের ভার অর্পণ করিলাম।

শিক্ষিতা

পতিতার আত্মচরিত

প্রথম

বাল্যে

১৩০৭ সালের ১৮ই আষাঢ় তারিখে আমি জন্ম গ্রহণ করি। আমার পিতা কলিকাতার এক সম্ভ্রান্তবংশীয় ব্রাহ্মণ। আমি তাঁহার প্রথম সন্তান। পিতার নাম ও পরিচয় প্রকাশ করিতে আমি অক্ষম। তিনি, তাঁহার জ্ঞাতি কুটুম্ব, সন্তান-সন্ততি এবং সম্পর্কিত ব্যক্তিগণ অনেকেই এক্ষণে জীবিত রহিয়াছেন। সমাজে তাঁহাদের মান মর্য্যাদা কম নহে। আমার এই আত্মচরিত হয়ত তাঁহাদের হাতে পড়িতে পারে। আমি তাঁহাদিগকে বিব্রত করিতে চাহি না।

আমার পিতামহ একজন সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থ ছিলেন। কলিকাতাতে তাঁহার চারিখানা বাড়ী এবং নগরের উপকণ্ঠে একখানা বাগান বাড়ী ছিল। তিনি বৃদ্ধ বয়সে রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। আমার পিতা হাইকোর্টের উকীল ছিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার পসার বেশ জমিয়া উঠে, বাহিরেও তিনি মাঝে মাঝে যাইতেন।

আইন কলেজে পড়িবার সময় আমার পিতার বিবাহ হইয়াছিল। তখন আমার পিতামহ জীবিত। আমার মাতুল পরিবারও কলিকাতায় বাস করিতেন। তাঁহারা বিশেষ অর্থশালী ছিলেন

না—কিন্তু বংশ মর্য্যাদায় উচ্চ এবং রূপে অতুলনীয় সুন্দরী বলিয়া আমার মাতাকে পুত্র-বধু করিবার জন্য পিতামহ বিশেষ আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন। আমার জন্মের দুই বৎসর পর আমার পিতামহের মৃত্যু হয়।—ঠাকুরদাদার কোলের সুখলাভ যে আমার ভাগ্যে ঘটিয়াছিল—কেবল মাত্র কল্পনাতেই সেই স্মৃতি জাগিয়া আছে।

কন্যা বলিয়া আমি শিশুকালে অনাদৃত হই নাই। পিতার বন্ধুগণ কেহ কেহ বলিলেন, "প্রথম কন্যাসন্তান, সৌভাগ্যের লক্ষণ"। কথাটা হাস্য পরিহাসের সহিত বলা হইলেও, তাহার মধ্যে সত্য রহিয়াছে বোধ হইল। আমার জন্মের কয়েক মাস পূর্ব্বে পিতা আইন ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছিলেন। দিন দিন তাঁহার উন্নতি দেখা গেল। কিছুকাল মধ্যেই আমার পিতা কোন সুযোগে বার্ষিক দশ হাজার টাকা আয়ের একটা ছোট জমিদারী নীলামে ক্রয় করিলেন।

শৈশব অবস্থায় আমার শরীর রুগ্ন ছিল। মা আমাকে লইয়া সর্ব্বদাই বিব্রত থাকিতেন। পিতামহ আমার স্বাস্থ্যের জন্য প্রচুর অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। মৃত্যুশয্যায় তিনি নাকি আমার দিকে চাহিতে চাহিতে চক্ষু মুদিয়াছিলেন। আজ মনে হয়, সেই ঋষিতুল্য বৃদ্ধ বুঝি তাঁহার শেষ নিশ্বাস আমার প্রাণের মধ্যে রাখিয়া গিয়াছেন, তাই আমি মরিতে মরিতেও বার বার বাঁচিয়া উঠিতেছি।

আমার যখন তিন বৎসর বয়স, তখন একবার কঠিন জ্বরে আক্রান্ত হইয়াছিলাম। কলিকাতার বড় বড় ডাক্তার কবিরাজ আমার জীবনের আশা ছাড়িয়া দিয়াছি লেন। আমার সমস্ত ইন্দ্রিয়শক্তি লুপ্ত হইয়াছিল। মহামহোপাধ্যায় স্বর্গীয় দ্বারকা নাথ সেন আমার চিকিৎসায় বিশেষ নৈপুণ্য দেখাইয়া ছিলেন।

মা নিত্য শিবপূজা করিতেন। একদিন দুশ্চিন্তার উদ্বেগে নিতান্ত কাতর চিত্তে তিনি পূজার ঘরে অচেতন হইয়া পড়েন। জ্ঞান সঞ্চার হইলে মা বলিলেন, "খুকুমণি সেরে উঠ্‌বে, আর কোন ভয় নেই।" তিনি অন্তরে অন্তরে তাঁহার অভীষ্ট দেবের নিকট হইতে কোন আশ্বাস পাইয়াছিলেন কিনা কে জানে, তার পর হইতে বাস্তবিক আমার দেহ একপ্রকার ঔষধাদি ব্যতীতই নীরোগ হইতে লাগিল। চারি মাসের মধ্যে আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হইলাম।

একটা প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। মেঘমুক্ত চন্দ্রের মত আমার দেহকান্তি দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আমার পরিপুষ্ট অবয়ব—উজ্জ্বল মুখ-শ্রী—দীর্ঘ নিবির কুন্তলশোভা—আনন্দোৎফুল্ল চলন ভঙ্গী দেখিয়া আত্মীয় স্বজন ও প্রতিবেশীগণ সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইল। আমি পূর্ব্বে ধীর ও শান্তপ্রকৃতি ছিলাম; কিন্তু এই রোগ ভোগের পর আমি কিছু চঞ্চল স্বভাব হইয়া উঠিলাম। বিস্কুট লজেঞ্জুস কিনিবার জন্য মায়ের নিকট হইতে পয়সা লইয়া বড় রাস্তার উপরে মনোহারী দোকানে ছুটিয়া যাইতাম—ঘুড়ী ধরিবার জন্য আমাদের বাড়ীর প্রশস্ত ছাদে দৌড়াদৌড়ি করিতাম—অবশ্য পড়িয়া যাইবার আশঙ্কা ছিল না। ঝির সঙ্গে কখনও কখনও তাহাদের বাড়ীতে চলিয়া যাইতাম। চাকরেরা আমার দুষ্টামীতে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিত। বাবার বৈঠকখানা ঘরে যাইয়া আমি গোলযোগ আরম্ভ করিতাম। বাড়ীতে আর ছোট ছেলে মেয়ে কেহই ছিল না। একমাত্র আমার চীৎকার ও হাস্য কলরবে এত বড় বাড়ীখানি সর্ব্বদা মুখরিত থাকিত। বাবার নিকট আমার ছেলে বেলার এই সকল কথা শুনিয়া আমি সঙ্কুচিত হইতাম।

স্নান করা আমার অতি আনন্দের বিষয় ছিল। মায়ের অনুরোধে বাবা আমার জন্য বাড়ীর উঠানে একটা বৃহৎ চৌবাচ্চা তৈয়ারী করাইয়াছিলেন। তার মধ্যস্থলে সুন্দর ফোয়ারায় জল উঠিত। ছয় সাত বৎসর বয়সে আমি সাঁতার শিখিয়াছিলাম। স্নান করিবার সময় আমর সমবয়সী প্রতিবেশী ছেলে মেয়েদের ডাকিয়া আনিতাম। আমরা সকলে চেঁচামেচি হুটোপাটি করিয়া সেই বৃহৎ চৌবাচ্চার জলে হাঁসের মত ঘণ্টার পর ঘণ্টা খেলায় মত্ত থাকিতাম। মা আমাকে অত্যন্ত আদর করিতেন, সেই জন্য বাবা আর কিছু বলিতেন না।

আমার আর একটী অভ্যাস ছিল—প্রত্যহ বৈকালে বেড়াইতে বাহির হওয়া চাই। যে দিন বাবা বাহিরে যাইতেন না, সেদিন আমি মায়ের সঙ্গে মোটরে চড়িয়া যাইতাম। আমার এক মামাত ভাই আমাদের বাড়ীতে থাকিয়া স্কুলে পড়িত। তাঁহার নাম ছিল নন্দলাল, তাঁহাকে আমি নন্দ দাদা বলিয়া ডাকিতাম। তাঁহার সঙ্গে কখনও কখনও হাঁটিয়া বেড়াইতে যাইতাম। রাস্তার দুইধারে সুন্দর সুন্দর সাজান দোকানপাট, ট্রামগাড়ী, আলোকমালা, অসংখ্য লোক চলাচল, সেসব দেখিয়া আমার মনে কি আনন্দ হইত! আলিপুরের চিড়িয়াখানা, চৌরঙ্গীর যাদুঘর, হাবড়ার পুল, পরেশ-নাথের বাগান, কালীঘাটের মন্দির এসকল আমি বালিকা বয়সেই অনেকবার দেখিয়াছি।

পুতুলখেলা অপেক্ষা পাখী পুষিবার সখই আমার ছিল বেশী। পায়রা, ময়না, টিয়াপাখী, কাকাতুয়া, হীরেমন, শালিক প্রভৃতি নানপ্রকার সুন্দর পাখী বাবা আমাকে আনিয়া দিতেন। কুকুর

বিড়াল আমি ভাল বাসিতাম না। ফুলগাছেও আমার মন আকৃষ্ট হইত না। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে পাখীর নেশা আমার কমিয়া আসিয়াছিল।

দ্বিতীয়বার এক মৃত সন্তান প্রসবের সময় আমার মায়ের মৃত্যু হয়। আমার বয়স তখন দশ বৎসর। প্রাণে দারুণ আঘাত পাইলাম। মৃত্যু কি, তাহা তখন আমি বুঝিতাম। আমাকে কেহ মিথ্যা বাক্যে ভুলাইতে পারিল না—কেহ আমাকে সান্ত্বনার কথা বলিতে পারিল না। আমি চীৎকার করিয়া মাটিতে লুটাইয়া কাঁদিলাম। বাবা আমাকে কোলে তুলিয়া লইলেন। কিন্তু আমি ছিন্নশির ছাগশিশুর মত ছট্‌ফট্ করিতে করিতে বাবার কোল হইতে নামিলাম। প্রতিবেশীগণ মায়ের মৃত দেহ পালঙ্কের উপর পুষ্প-মালায় সাজাইয়া কাঁধে করিয়া লইয়া গেল। আমি তাহাদের পশ্চাতে ছুটিয়া চলিলাম। আমার মনে আছে, কতকদূর যাইয়া ফুটপাতের উপর আছড়াইয়া পড়িয়াছিলাম। মুখ তুলিয়া সম্মুখে চাহিয়া দেখি, বাহকেরা দূরে চলিয়া গিয়াছে। পালঙ্কের পশ্চাদ্দিকে মায়ের আল্‌তা মাখান পা-দুখানি বাহির হইয়া রহিয়াছে; তাহাই আমার দৃষ্টি পথে।

আজ আমার দুঃখময় জীবনের কাহিনী লিখিতে বসিয়া চক্ষুর জল ঝরিতেছে। কত দিন কত দুঃখে অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছি—আমার মনে হইয়াছে, তাহা মায়ের সেই চরণযুগলে নিপতিত হইয়া তাঁর শুষ্ক অলক্তক-রাগকে আরও উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে।

মায়ের মৃত্যুতে বাবা খুব কাঁদিয়াছিলেন। তিন দিন পর্য্যন্ত তিনি কিছু আহার করেন নাই। অবশেষে বন্ধুদের সনির্ব্বন্ধ

অনুরোধে খাদ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। বাবার শয়নগৃহের প্রাচীরে মায়ের একখানি বৃহৎ সিপিয়া রংএর ব্রোমাইড এনলার্জ্জমেণ্ট্ ছবি ছিল। আমার সপ্তম জন্মতিথিতে বাবা আমাকে উহা উপহার দিয়াছিলেন। সাড়ে সাত শত টাকা ব্যয়ে তিনি ঐ ছবিখানি বিলাত হইতে তৈয়ারী করাইয়া আনেন। মায়ের মৃত্যুর পর হইতে বাবা নিত্য এক ছড়া ফুলের মালা দিয়া ছবিখানিকে সাজাইতেন।

মায়ের জীবদ্দশাতেই আমি বেথুন স্কুলে ভর্ত্তি হইয়াছিলাম। তাঁহার মৃত্যুকালে আমি ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রী। বাড়ীতে একজন গৃহ শিক্ষক আমাকে ও নন্দ দাদাকে পড়াইতেন। মায়ের মৃত্যুর পর বাবা আমাকে স্কুলে হইতে ছাড়াইয়া আনিলেন। বাড়ীতে অধিক সময় পড়াইবার জন্য একজন ভাল শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন। আমাকে সর্ব্বদা কাছে কাছে রাখিয়া শোকবেগ কতকটা প্রশমিত করিবার জন্যই বোধ হয় বাবা এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। যাহা হউক ইহাতে আমার পড়াশুনার কোন ক্ষতি হইল না।

ছয় মাস চলিয়া গেল। তখন বাংলাদেশে স্বদেশী আন্দোলনের অব্যবহিত পরেই বোমার গোলযোগ আরম্ভ হইয়াছে। নেতাদের নির্ব্বাসন, যুবকদের কারাদণ্ড, বিপ্লববাদীদের গ্রেপ্তার, বোমা-ওয়ালাদের ফাঁসী, এই সকল ভীষণ ব্যাপারে দেশময় একটা চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে। নানাস্থানে সভা সমিতি, লাঠিখেলার আখ্ড়া প্রভৃতি স্থাপিত হইল। আমার পিতা এই আন্দোলনের মধ্যে ছিলেন। নন্দ দাদা আমাকে মাঝে মাঝে স্বদেশী সভায় লইয়া যাইতেন। সেখানে কত উত্তেজনাময় বক্তৃতা শুনিতাম।

একটা কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি। আমি বেশ গান গাহিতে পারিতাম। স্বাভাবিক শক্তিতেই আমার সুর তাল জ্ঞান ছিল, কণ্ঠস্বরও নাকি আমার সুমিষ্ট—যাঁহারা আমার গান শুনিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই আমার এই প্রশংসা করিতেন। সঙ্গীতের ক্ষমতা আমার কিরূপে জন্মিল, আমি বুঝিতে পারি না। আমার পিতামাতা কেহই সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন না। বাবা আমাকে একটী খুব ভাল টেবিল হারমোনিয়ম কিনিয়া দিয়াছিলেন। এক জন শিক্ষক আমাকে এস্রাজ বাজ্‌না ও গান শিখাইতেন।

একদিন দেখিলাম নন্দদাদা দুইখানি লম্বা ছোরা কিনিয়া আনিয়াছে। আমার সম্মুখে টেবিলের উপর ছোরা দুইখানি রাখিয়া বলিল "মানি, তোকে ছোরা খেলা শিখ্‌তে হবে।" আমি একখানি ছোরা হাতে লইয়া বলিলাম, "সে কি নন্দ-দা?" নন্দ-দা আর একখানি ছোরার বাঁট ধরিয়া তাহার অগ্রভাগ আমার বুকের দিকে [illegible] করিল। অপর হস্তে আমার ডান হাতের কব্জি ধরিয়া এমন ভঙ্গিমায় দাঁড়াইল, যেন সে সত্যই আমাকে মারিতে উদ্যত। আমিও বা হাতে নন্দদা'র ডান হাতের কব্জি ধরিয়া ফেলিলাম। সে বলিল "এই ত ঠিক, এমনি করেই ত আট্‌কাতে হয়।" আমি কিছুদিন পূর্ব্বে এক স্বদেশী সভায় ছেলেদের ছোরা খেলা দেখিয়াছিলাম, আমি বলিলাম "মেয়েদের এসব শিখে কি হবে?" নন্দলাল বলিল "কেনরে মানী, শুনিস্ নি সেই গান,—"আপনার মান রাখিতে জননী আপনি কৃপাণ ধরগো"

আমি বলিলাম "হাঁ,—মনে আছে।" এই বলিয়া আমি

তখন টেবিল হারমোনিয়মের সম্মুখে যাইয়া বসিলাম। তাহার ঢাক্‌না খুলিয়া চাবি টিপিয়া গলা ছাড়িয়া গান ধরিলাম,—

আপনার মান রাখিতে জননী, আপনি কৃপাণ ধরগো,—
পরিহরি চারু কনক ভূষণ গৈরিক বসন পরগো।
আমরা তোর কোটী কুসন্তান,
ভুলিয়া গিয়াছি আত্ম বলিদান,
করে মা পিশাচে তোর অপমান প্রতিকার তার করগো।

গান শেষ হইলে বাবা আসিয়া বলিলেন "কিরে, খুকু—তোদের কি হচ্ছে?" নন্দ-দা মুহুর্ত্তের মধ্যে ছোরা দুখানি লইয়া আর এক দরজা দিয়া ছুটিয়া পলাইল। আজও আমার সে দিনের ঘটনা বেশ মনে আছে।

সে দিন বাবা আমাকে এক স্বদেশী সভায় লইয়া গেলেন। এই গানটী আমি সভাস্থলে গাহিলাম। সকলে আমার খুব প্রশংসা করিল। ৺সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সেই সভার সভাপতি ছিলেন। আমি তখন বুঝিতে পারি নাই—উহাতেই আমার সর্ব্বনাশ হইতেছে। ঐ সভাতে বাবা এক বক্তৃতা দিলেন।

তখন দামোদরের বন্যায় বর্দ্ধমান সহর ও তাহার নিকটবর্ত্তী বহুদূরব্যাপী স্থানসমূহের গৃহস্থগণ আশ্রয়হীন এবং দুর্দ্দশাগ্রস্থ হইয়াছিল। তাহাদের দুরবস্থা মোচনের জন্য সাহায্য ভাণ্ডার খোলা হয়। দেশের সহৃদয় জনসাধারণ তাহাতে অর্থদান করেন। অধিক পরিমাণে অর্থ সংগ্রহের জন্য কলিকাতার থিয়েটার সিনেমায় বেনিফিট্ নাইট অর্থাৎ সাহায্য রজনী ও অপর নানাবিধ আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থাও হইয়াছিল।

এই উপলক্ষে বাবা আমাকে কয়েকবার থিয়েটার ও বায়স্কোপ দেখাইতে লইয়া গিয়াছিলেন। নন্দ দাদাও সঙ্গে যায়। থিয়েটারের অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের সঙ্গীত ও অভিনয় দেখিয়া আমি অতিশয় মুগ্ধ হইয়াছিলাম। আমার মনে আছে, আমি প্রথম নাটক অভিনয় দেখি—দেবীচৌধুরাণী ও আলিবাবা। দেবী-চৌধুরাণীর 'বীণা—বাজেনা কেন' এবং আলিবাবার 'ছি ছি এত্তা জঞ্জাল' এই দুইটী গান আমি এমন সুন্দর অনুকরণ করিয়াছিলাম যে আমার পিতা অনেকবার বাড়ীতে আমার মুখে উহা শুনিয়া-ছিলেন। রবিবার বায়স্কোপে যাওয়া আমার ক্রমশঃ অভ্যাস হইয়া উঠিল। কখনও নন্দ দাদা,—কখনও বা বাবা নিজে আমার সঙ্গে যাইতেন। কোন কোন রবিবারে আমি বাবার সঙ্গে ব্রাহ্ম-সমাজের উপাসনা মন্দিরে যাইতাম। আমার পিতা ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন না, কিন্তু সামাজিক রীতিনীতিতে তিনি ব্রাহ্মদের মত উদার ভাবাপন্ন ছিলেন।

মাতার মৃত্যুর পর হইতে বাবা প্রতিদিন মায়ের ছবিতে একটী ফুলের মালা দিতেন।

এখন আর মায়ের ছবিতে ফুলের মালা দেওয়া হয় না। বহুদিন যাবৎ একছড়া বেলফুলের মালা উহাতে শুকাইয়া ছিল, একদিন চাকর দেওয়াল ঝাড় দিতে উহা ফেলিয়া দিয়াছে। আমাদের কাহারও মনেই তাহাতে কোন চঞ্চলতা বা বিরক্তি আসে নাই। সকাল ছয়টা হইতে নয়টা—অপরাহ্ন একটা হইতে চারিটা মাষ্টার মহাশয় পড়াইতেন। শনিবারে কখনও কখনও থিয়েটারে, রবিবারে বায়স্কোপে যাওয়া আমার নিয়মিত কার্য্য মধ্যে ছিল।

নন্দ দাদার চেষ্টায় ছোরা খেলা শিখিয়াছিলাম।—আমার ডান হাতে একটা বড় কাটার দাগ এখনও তার সাক্ষী। বাবার আদেশে ছোরা খেলা পরিত্যাগ করি। তার পরিবর্ত্তে গল্পের পুস্তক পড়ায় আমার মন আকৃষ্ট হইল। আমার গৃহশিক্ষক মহাশয় ইহাতে আমাকে বিশেষ উৎসাহ দিতেন।

'দেবীচৌধুরাণী' নাটক অভিনয় দেখিবার পর আমি বোধ হয় 'ভ্রমর' ও 'কপালকুণ্ডলা' দেখিয়াছিলাম। মাষ্টার মহাশয় একদিন আমাকে বলিলেন, বঙ্কিম বাবুর লেখা আসল বই না পড়্‌লে, রস ও সৌন্দর্য্য উপলব্ধি হয় না। আমাদের বাড়ীতে তিনটী আলমারী বোঝাই অনেক পুস্তক ছিল। মাষ্টার মহাশয় অনুসন্ধান করিয়া তাহার মধ্য হইতে বঙ্কিম বাবুর গ্রন্থাবলী বাহির করিয়া দিলেন। আমি দিবারাত্রি সেই উপন্যাস পাঠ করিতে লাগিলাম। সকল স্থানে বুঝিতে পারিতাম না। কিন্তু তথাপি প্রাণে কেমন একটা অপূর্ব্ব পুলকের সঞ্চার হইত।

আমাকে দেখাশুনা করিবার নিমিত্ত আমার বিধবা পিসিমা আসিয়াছিলেন। তিনি আমার পিতার জেষ্ঠ্যা ভগিনী। আমার যাহাতে কোন কিছুর অসুবিধা না ঘটে, সে বিষয়ে তিনি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতেন। একদিন আমি শুনিলাম, পিসিমা বাবাকে বলিতেছেন "হাঁরে খোকা এইত এক বৎসর প্রায় হ'য়ে এল। আর ত দেরী করা ভাল নয়। তোর শাস্ত্র জ্ঞান আছে—বংশ রক্ষা, পিতৃকুলের জলপিণ্ড, এসব তুই কি জানিস্ না।" আমি তখন ইহার অর্থ বুঝিতে পারি নাই।

কিছুদিন পরে বাবা আমাকে পুনরায় বেথুন স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া

দিলেন। আমি পঞ্চম শ্রেণীতে পড়িতে লাগিলাম। আমি স্কুলের গাড়ীতেই যাতায়াত করিতাম। কারণ—বাবা বলিলেন, তাঁহাকে এখন প্রায়ই মোটরে বাহিরে যাইতে হয়, সুতরাং আমাকে ঠিক সময়ে স্কুলে পৌঁছাইতে ও স্কুল হইতে লইয়া আসিতে নিজেদের মোটর সর্ব্বদা সময় পাওয়া যাইবে না। গৃহ শিক্ষক মহাশয় সকালে ও সন্ধ্যায় দুবেলা আমাকে পড়াইতেন।

যতদিম মা বাঁচিয়া ছিলেন, আমি মায়ের সঙ্গে এক বিছানায় ঘুমাইয়াছি। মায়ের মৃত্যুর পর আমি বাবার ঘরে পৃথক বিছানায় শুইতাম। একদিন বাবা আমাকে বলিলেন, "খুকু—তুমি তোমার পিসিমার কাছে ঘুমিও"। আমি কখনও পিতার অবাধ্য হই নাই। আর একদিন বাবা চাকরকে ডাকিয়া দেওয়ালে মায়ের ছবিখানা দেখাইয়া বলিলেন, "এই বড় ছবিখানা খুকুর পড়্‌বার ঘরে টানিয়ে দিস্ ত।" আমার জন্য দুইটি নূতন বড় বুক্‌কেস্, একখানা বড় মেহগিনি কাঠের সুন্দর টেবিল ক্রয় করা হইয়াছিল। তাহা আমার পড়িবার ঘরে সাজান হইল। মেজেতে পাতিবার জন্য সুন্দর কার্পেট আসিল। একটা কাট্‌গ্লাসের খুব দামী দোয়াতদানী ও একটী ওয়াটারম্যানের ফাউণ্টেন পেন বাবা আমাকে দিলেন। গ্রীষ্মকাল পড়িয়াছিল; আমার পড়িবার ঘরের বিজলী পাখায় নূতন রং করা হইল। আরও চারিখানা সুন্দর বিলাতী ল্যাণ্ডস্কেপ ছবির সঙ্গে মায়ের ছবিখানাও সেই ঘরে শোভা পাইল। মাষ্টার মহাশয় আমার পড়িবার ঘরের সাজসজ্জা দেখিয়া অতিশয় প্রীত হইলেন। আমি স্কুলের পড়ায়, নভেলে, থিয়েটার ও সিনেমার আমোদে নিমগ্ন।

এমন সময় এক বসন্ত প্রভাতে আমাদের গৃহদ্বারে নহবতে

সুমধুর রৌসানচৌকী বাজিয়া উঠিল। প্রতিবেশী বন্ধুগণ ও আত্মীয় স্বজন আনন্দ কোলাহলে মত্ত। পিসিমা কার্য্যে অতিশয় ব্যস্ত। পিতাকে নব বর-বেশে সজ্জিত দেখিলাম। পুষ্পপত্রে শোভিত চতুর্দ্দোল আসিয়াছে। শুভ সন্ধ্যায় শোভাযাত্রার আলোকমালা জ্বলিয়া উঠিল। আমিও উৎসবে মাতিলাম। আমার পড়িবার ঘরের সম্মুখ দিয়া যাইবার সময় হঠাৎ মায়ের সেই ছবিখানির দিকে আমার দৃষ্টি পড়িল। আমি মুহূর্ত্তের জন্য স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলাম; আমার চক্ষে জল আসিল। তার পর ধীরে ধীরে যাইয়া বিছানায় শুইলাম। কেহ আমাকে লক্ষ্য করিল না। পরদিন যখন ঘুম ভাঙ্গিল—দেখিলাম বিমাতা আসিয়াছেন।

দ্বিতীয়

কৈশোরে

ক্রমশঃ উৎসবের কোলাহল থামিল। দিন দিন আমিও প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করিতে লাগিলাম। পিসিমার থাকিবার আর প্রয়োজন রহিল না। নব বধূকে সংসার ধর্ম্ম বুঝাইয়া দিয়া তিনি ছয় সাত মাস পরে চলিয়া গেলেন। আমি তখন হইতে পিসিমার ঘরে একাকিনী শয়ন করিতাম।

বিমাতা বয়সে আমার অপেক্ষা এক বৎসরের বড় ছিলেন। আমার দেহের গঠন পরিপুষ্ট এবং বলিষ্ঠ হওয়ায় আমাকেই বড় দেখাইত। তিনি সুন্দরী ছিলেন—গৃহকার্য্য ও লেখাপড়া সামান্য-রূপ জানিতেন। তাঁহার সহিত আমার বনিবনাও না হইবার কোন কারণ ছিল না, কারণ আমি অধিকাংশ সময় আমার পড়াশুনা লইয়াই ব্যস্ত থাকিতাম।

বাবা অন্তঃপুরে আসিলে, বিমাতা প্রায়ই কোন কার্য্য ছলে তাঁহার কাছে থাকিতেন। বিশেষ কোন প্রয়োজন ব্যতীত পিতার সহিত এখন আমার সাক্ষাৎ হইত না। পূর্ব্বে তিনি আমাকে স্কুলের পড়ার কথা জিজ্ঞাসা করিতেন—কাছে বসিয়া আমার গান শুনিতেন, এখন আর তাহা নাই। বাবা যেদিন বিমাতাকে লইয়া থিয়েটারে যাইতেন, আমাকে নিতেন না, সে-দিন নন্দদাদার সঙ্গে আমি বায়স্কোপে যাইতাম।

কি কারণে জানি না, আমার পুরাতন গৃহ-শিক্ষককে ছাড়াইয়া দেওয়া হইল। বাবা আমাকে বলিলেন "তুমি এখন উপরের ক্লাসে পড়্‌ছ, পুরাণো মাষ্টারের বিদ্যা ত বেশী নয়; আজ কালকার স্কুল কলেজের শিক্ষাপ্রণালীর সহিত পরিচিত লোক না হলে চলেনা।" কয়েকদিন পরে আমার জন্য নূতন মাষ্টার আসিলেন। ইহার একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক।

প্রথম যেদিন তিনি পড়াইতে আসিলেন, সেইদিনই তাঁহার আকৃতি প্রকৃতি ও পরিচ্ছদে আমি একটু আকৃষ্ট হইলাম। তাঁহার লম্বা লম্বা চুল কপাল হইতে উল্‌টা দিকে আঁচড়ান এবং ঘাড়ের কাছে ঝাঁকৃড়া ঝাঁকৃড়া বাবড়ী পাকান—তাঁহার বয়স আন্দাজ বাইশ তেইশ—দাঁড়ী গোঁপ উঠে নাই—না পরিস্কার কামানো তাহা বুঝিতে পারিলাম না। কাপড় ঢিলা মালকোঁচা দিয়া পরিয়াছেন, মনে হয় যেন কাবুলীদের পা-জামা। গায়ে একটা পরিষ্কার ধব্‌ধবে সাদা পাঞ্জাবী জামা—তখনও খদ্দরের চলন হয় নাই। তাঁহার সূক্ষ্মাগ্র উন্নত নাসিকা—চোখ দুটী সুন্দর—কিন্তু একজোড়া সোণার ফ্রেমে বাঁধান চশমা সেই সৌন্দর্য্যকে অন্য রূপ দিয়াছে। পায়ে নকল জরীর কাজ করা নাগরা জুতা। তাঁহার বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম—দেহ অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ। তাঁহার কথায় যেন বাঁশী বাজে। তিনি সম্প্রতি বি, এ পাশ করিয়া কোন স্কুলে শিক্ষকের কার্য্য করিতেছেন। মাষ্টার মহাশয় অবিবাহিত।

তাঁহার নিকট আমার পড়াশুনা ভালই হইতে লাগিল। তিনি গণিত শাস্ত্র বিশেষ জানিতেন না—তবে সাহিত্য, ইতিহাস বিশেষতঃ কাব্য তিনি অতি চমৎকার পড়াইতেন। সকালে বিকালে

দুইবেলাই তিনি আসিতেন। আমি চতুর্থ শ্রেণী হইতে প্রমোশন পাইয়া তৃতীয় শ্রেণীতে উঠিলাম।

নন্দদাদা আমার দুই ক্লাশ উপরে পড়িত। এবার তার এণ্ট্রান্স্ ক্লাসে উঠিবার কথা। কিন্তু লেখাপড়ায় বিশেষ মনোযোগ না থাকায় সে বার্ষিক পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইল। সুতরাং দ্বিতীয় শ্রেণীতেই রহিয়া গেল। নন্দ দাদা ও আমি একই মাষ্টার মহাশয়ের নিকট পড়িতাম।

দুই চারি দিনের পরিচয়ের পর একদিন মাষ্টার মহাশয় আমাকে বলিলেন "মানু, তুমি আমাকে 'মাষ্টার মশাই' বলোনা— এ ডাকটা আমি ভারী অপছন্দ করি। আমাকে আমার নাম ধরে, ডাক্‌তে পার।" আমি কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া বলিলাম— আপনি যেমন 'মশাই' কথাটা পছন্দ করেন না—আমিও তেমনি নামের শেষে 'বাবু' যোগ করা ভালবাসিনা। দেখেন নি—আজকাল 'বাবু' উঠে গিয়ে 'শ্রীযুতের, প্রচলন হয়েছে ?"

মাষ্টার মহাশয় হাসিয়া বলিলেন, "তা বেশ, তুমি আমাকে "মুকুল দাদা" বলে ডাক্‌তে পার। তুমি ত জান আমার নাম মুকুল বন্দ্যোপাধ্যায়।" এইরূপে মাষ্টার মহাশয়ের সহিত আমার ঘনিষ্ঠতা জন্মিতে লাগিল। আমি সেইদিন হইতে তাঁহাকে দাদা বলিয়া সম্বোধন করি।

একদিন বাবা আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "খুকু, তোমার মাষ্টার মহাশয়ের সকালে বিকালে চা খাওয়ার অভ্যাস আছে। ওর চায়ের ব্যবস্থাটা এখানেই করে' দিও। তাহ'লে তিনি আরও একটু আগে আস্‌তে পারেন।"

আমাদের বাড়ীতে দু'বেলাই চা তৈরী হইত। পূর্ব্বে বাবার সঙ্গে বসিয়া চা খাওয়া আমার নিয়ম ছিল। আজকাল বাবার চায়ের পেয়ালা বিমাতা হাতে করিয়া নিতেন। বাবাও আমাকে কখন ডাকেন নাই; আমিও আর সেদিকে যাইতাম না। আমি মাষ্টার মহাশয় আসিবার পূর্ব্বেই আমার পড়িবার ঘরে একলা বসিয়া চা খাওয়া শেষ করিতাম।

এখন মাষ্টার মহাশয় আমার চা পানের সঙ্গী হইলেন। সেই সময় আমাদের মধ্যে সামাজিক ও রাজনীতিক নানা কথাবার্ত্তা হইত। তখন দেশ-নেতাদের মহলে 'আত্মশক্তির' কথা উঠিয়াছে। মাষ্টার মহাশয় বলিলেন "মানু, আমাদের দেশের শাস্ত্রকারেরা সুখ দুঃখের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন 'সর্ব্বং আত্মবশং সুখং সর্ব্বং পরবশং দুঃখং।' অন্নবস্ত্র ত দূরের কথা, সামান্য বিষয়ের জন্যও আমাদিগকে পরের উপর নির্ভর করতে হয়। এই দেখনা কেন, চাকর চা তৈয়ারী করিয়া না দিলে আমাদের চা খাওয়া হয়না; অথচ ইহা দুই মিনিটের কাজ। আমাদের সমাজে ও পরিবারে বিলাসিতা এত বেড়ে উঠেছে।"

বাবাকে বলিয়া আমি একটী ছোট ইলেক্‌ট্রীক হিটার কিনিলাম। আমার পড়িবার ঘরে বিজ্‌লী বাতির প্লাগ্‌ ছিল। তাহার সাহায্যে আমি সহজে জল গরম করিবার ব্যবস্থা করিলাম। পরদিন মাষ্টার মহাশয় আসিলে যখন স্বহস্তে চা তৈয়ারী করিয়া তাঁহার সম্মুখে পেয়ালা ও প্লেট ধরিলাম, তখন তিনি আনন্দে হাত বাড়াইয়া বলিলেন "বাঃ, উপযুক্ত ক্ষেত্রে পড়্‌লে উপদেশের বীজ এমনি ফলপ্রদ বৃক্ষে পরিণত হয়।"

আমি তখন লক্ষ্য করি নাই, আমার ঐ সোনার চুড়ী-পরা হাতখানির ছায়া পেয়ালার মধ্যস্থিত তপ্ত তরল পদার্থে পড়িবার পূর্ব্বে মাষ্টা মহাশয়ের হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়াছিল।

পূজার সময় হাইকোর্টের দীর্ঘ অবকাশ। বাবা বিমাতাকে লইয়া পশ্চিমে বেড়াইতে গেলেন। তাঁহাদের সঙ্গে দুইজন ভৃত্য ব্যতীত আর কেহ ছিলনা। আমার যাইবার খুব ইচ্ছা ছিল। কিন্তু মুখ ফুটিয়া বাবাকে কিছু বলিতে পারি নাই। কারণ, আমাকে সঙ্গে নেওয়া যে তাঁহার অভিপ্রায় নয়, তাহা আমি পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলাম। আমার হৃদয়ে দারুণ আঘাত পাইলাম। বিদেশে যাইয়া পিতা অথবা বিমাতা কেহই আমার নিকট চিঠিপত্র লেখেন নাই। পিসিমা আসিয়া বাড়ীতে ছিলেন। তিনি মধ্যে মধ্যে দুই একখানি চিঠি পাইতেন—আর টাকা পাঠাইবার জন্য সরকার মহাশয়ের নিকট চিঠি আসিত।

একদিন নন্দ দাদা আমাকে বলিল "মানী, আজ মিনার্ভা থিয়েটারে যাবে?—চল—শিরীফরহাদ্ প্লে—খুব সুন্দর অপেরা। একেবারে অফুরন্ত নাচগান। সে একখানি বিজ্ঞাপন দেখাইল। পিসিমার কাছে অনুমতি চাহিলে তিনি বলিলেন "তোরা দু'জনই ছেলে মানুষ, মাষ্টার মশাইকে সঙ্গে নিযে গেলে ভাল হয়।" বলা বাহুল্য, মাষ্টার মহাশয় আপত্তি করিলেন না।

আমরা তিনজনে একটা বক্স্ রিজার্ভ করিয়া বসিয়াছিলাম। অভিনয় দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইলাম। বিশেষতঃ নৃত্যগীত আমাকে অতিশয় প্রীত করিয়াছিল। মাষ্টার মহাশয় প্রতিদৃশ্যের ঘটনাবলী ও চরিত্র সমূহ বিশ্লেষণ করিয়া আমাকে বুঝাইয়া দিলেন। ফর্হাদের

অপূর্ব্ব প্রেম ও শিরীর আত্মবিসর্জ্জন আমার হৃদয়কে উল্লসিত করিয়া তুলিল। আমি অনুভব করিলাম, আমার বুকের মধ্যে যেন কোন সুষুপ্ত পশুর ঘুম ভাঙ্গিতেছে।

মাষ্টার মহাশয় প্রায়ই আমাদের সঙ্গে থিয়েটারে ও সিনেমায় যাইতেন। তিনি না গেলে আমার আমোদ উপভোগ সম্পূর্ণ হইত না। কারণ তিনি সমস্ত বিষয়টী পরিষ্কার রূপে বুঝাইয়া দিতেন। যে দিন বিল্বমঙ্গল, শঙ্করাচার্য্য কিম্বা ধর্ম্মমূলক অভিনয় হইত, সে দিন পিসিমাও আমাদের সঙ্গে যাইতেন। ভক্তি ও ধর্ম্মভাবের নাটকগুলি তাঁহার বড় প্রিয় ছিল।

আমার পিতা তখনও বিদেশে। আমি জ্বরে শয্যাগত। পিসিমা চিন্তাকুল। মাষ্টার মহাশয় দিবারাত্রি আমার শয্যাপার্শ্বে থাকিয়া আমার সেবা শুশ্রূষা করিতেছেন। ডাক্তার ডাকা, ঔষধ আনা, পথ্য তৈয়ারী, আমার কাছে বসা, প্রায় সমস্ত কাজ মাষ্টার মহাশয় করিতেন। তাঁহার স্কুল কামাই হইতে লাগিল। বেদনায় অস্থির হইলে তিনি আমার গা টিপিয়া দিতেন—মাথায় হাত বুলাইয়া আমাকে ঘুম পাড়াইতেন; আঙ্গুর, বেদানা, নাসপাতি একটু একটু করিয়া আমার মুখে পুরিয়া দিতেন। পিসিমা ইহাতে একটু আশ্বস্ত হইতেন।

যন্ত্রণায় কাতর হইয়া আমি যখন মা—মা বলিয়া কাঁদিতাম, তখন আমি লক্ষ্য করিয়াছি, মাষ্টার মহাশয় আমার সমবেদনায় চক্ষুর জল ফেলিয়াছেন। তিনি জানিতেন আমি মাতৃহীনা—পিতার অনাদৃতা কন্যা। একমাস পরে একটু সুস্থ হইয়া আমি ক্ষীণকণ্ঠে বলিলাম "মুকুলদা, আপনিই আমাকে এবার বাঁচিয়েছেন।" মাষ্টার

মহাশয় বলিলেন "মানু, ভগবান তোমায় রক্ষা করেছেন।" আমি তাঁহার হাতখানি ধরিয়া আবেগে উচ্ছসিত কণ্ঠে বলিলাম—মুকুল-দা আপনার স্নেহের ঋণ আমি শোধ করতে পারব না।"

সেই হইতে অন্যের অসাক্ষাতে মাস্টার মহাশয়কে 'তুমি' সম্বোধন আরম্ভ। আমাদের হৃদয় যেন পরস্পর অধিকতর নিকটবর্ত্তী হইল। একদিন তিনি একখানি সুন্দর বাঁধান ক্ষুদ্র কবিতা পুস্তক আমার হাতে দিয়া বলিলেন "মানু, আমার 'ঝরণা' ছাপা হয়েছে। তোমার সেবা করবার যে সুযোগ পেয়েছি, তাহাকে চিরস্মরণীয় কর্‌বার জন্য আমার এই প্রথম গীতিকাব্য তোমারই নামে উৎসর্গ করেছি।" আমি ঈষৎ লজ্জিতভাবে পুস্তকখানি লইয়া বলিলাম "মুকুলদা তুমি তোমার কবিতা ছাপাতে দিয়েছ, এ কথাত আমাকে কখনো বলনি! মাষ্টার মহাশয় হাসিয়া বলিলেন "ঐটী অপরাধ হয়েছে।"

আমাকে ইংরাজী সাহিত্য পড়াইবার সময় মাষ্টার মহাশয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা সমূহ বাংলা পদ্যে অনুবাদ করিয়া দিতেন। তিনি যে কবি ও ভাবুক তাহার পরিচয় পূর্ব্বে পাইয়াছিলাম। 'ঝরণার' অনেক কবিতা আমার সম্মুখেই লেখা হইয়াছিল। আজ পুস্তক আকারে গ্রথিত হওয়াতে উহার মধ্যে যেন নূতন ভাব দেখিতে পাইলাম।

দিল্লী, আগ্‌রা, মথুরা, বৃন্দাবন, বোম্বাই, লাহোর, প্রয়াগ, কাশী, গয়া প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করিয়া বাবা পাঁচ মাস পরে কলিকাতায় ফিরিলেন। হাইকোর্ট্ খুলিবার পরেও দুইমাস তাঁহার কামাই হইল। ওকালতী ব্যবসা করিবার আর তেমন ইচ্ছা তাঁহার

ছিলনা। এখন তিনি নিজের বিষয়—কর্ম্ম দেখিতে অধিক মন দিলেন।

আমার এক দূর সম্পর্কীয় জ্ঞাতি ভ্রাতা চাকুরীর চেষ্টায় এক দিন আমাদের বাড়ীতে পিতার নিকট আসেন। তাঁহাকে আমি পূর্ব্বে কখনও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। তিনি কিন্তু আমার সঙ্গে নিতান্ত পরিচিতের মত জিজ্ঞাসা করিলেন "কিরে মানু কেমন আছিস্—কোন্ ক্লাসে পড়িস্? কে তোকে বাড়ীতে পড়াচ্ছে," আমি বলিলাম—"এখন বেথুনে সেকেণ্ড ক্লাসে পড়্‌ছি। মুকুল বাবু আমার প্রাইভেট টিউটার।"

তিনি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন "ও—আমাদের 'ঝরণার' কবি মুকুল বাড়ুয্যে?—সে যে আমার ক্লাসফ্রেণ্ড্, একসঙ্গে স্কটীস্-চার্চ্চ কলেজে পড়েছি।" সন্ধ্যা বেলায় মাষ্টার মহাশয় আসিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া তিনি বলিলেন "কি ভাই মুকুল, শুন্‌লুম তুমি মানুকে পড়াচ্ছ—বেশ। তারপর—কাব্য চর্চ্চা ছাড়া আর কি কাজ কর্ম্ম হচ্ছে?"

মাষ্টার মহাশয় তাঁহার সঙ্গে অনেকক্ষণ নানা কথা বার্ত্তা কহিলেন্। আমাকে বলিলেন "রমেশ বাবু যে তোমাদের আত্মীয় এ-কথাত মানু তুমি কখনও আমায় বলনি।" আমি বলিলাম, "আমিত জানিতাম না। বাবা সেদিন এঁর পরিচয় দিলেন।" রমেশ দাদা বলিলেন "আমি প্রায় দশবৎসর পূর্ব্বে একবার এ-বাড়ীতে এসেছিলাম। তখন মানদার বয়স ৩।৪ বৎসর হবে। তখন আমি সবে মাত্র এণ্ট্রান্স দিয়েছি; স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হ'ল, পড়াশুনা ছেড়ে কয়েক বৎসর খুব হৈ চৈ করা গেল। তারপর

আবার কলেজে ভর্ত্তি হলুম। গত বৎসর এম্ এ পাশ করে এতদিন বসে আছি।”

আমার পিতার চেষ্টায় রমেশ দাদার একটা ভাল চাকুরী হইল—কোন লিমিটেড কোম্পানীর অফিসের বড় বাবু, বেতন মাসিক দুইশত টাকা। তিনি প্রথম প্রায় একমাস আমাদের বাড়ীতেই রহিলেন। পরে কোন বোর্ডিংএ একটা ভাল কামরা ভাড়া করিয়া থাকিলেন। বাবার নিকট বলিলেন “হাতে কিছু টাকা জমাইয়া বাড়ী ভাড়া করিব—তখন মা, স্ত্রী ও ছোট ভাই বোনদের এখানে লইয়া আসিব।” সেই বৎসরই রমেশ দাদার বিবাহ হইয়াছিল।

পিসিমা চলিয়া গিয়াছেন। আমার মায়ের মৃত্যুর পর হইতে বামুন ঠাকুরই রান্না করিত। দুইটী ঝি ও তিনটী চাকর আমাদের বাড়ীতে ছিল। দেহ-সুখের নিত্য প্রয়োজনীয় কোন জিনিসের অভাব আমার হয় নাই। সুস্বাদু খাদ্য পানীয়—বিচিত্র বসন-ভূষণ প্রচুর পরিমাণে আসিয়াছে। আমার পড়িবার ঘর ও শয়ন গৃহের সজ্জা অতুলনীয়, আরামের ব্যবস্থা একেবারে নিখুঁত। তথাপি আমার প্রাণের ক্ষুধা মিটিত না। পিতার অনাদর, অবজ্ঞা এই ক্ষুধাকে নিত্য সতেজ রাখিত। রাস্তা দিয়া যাইবার সময় যখন দেখিতাম কুলী-মজুরেরা তাহাদের ছেলেমেয়েকে কোলে লইয়া আদর করিতেছে, তখন আমি আমার সকল ঐশ্বর্য্যকে মনে মনে ধিক্কার দিতাম। আমি বুঝিয়াছিলাম, দৈহিক অভাব মোচনই আদর নহে—অন্নবস্ত্র প্রদানই আদর নহে—আদর প্রাণের জিনিস—প্রাণকেই উহা স্পর্শ করে—ভাবেই উহার প্রকাশ।

আমার ত্রয়োদশ জন্মতিথির পূর্ব্ব দিন বাবা আমাকে ডাকিয়া বলিলেন "খুকু, তোমার মাষ্টার মহাশয় ও রমেশদাকে নিমন্ত্রণ করো।" জন্মদিনের উৎসব করিতে আমার আর ভাল লাগিত না। তথাপি কোন প্রকারে দিনটা চলিয়া গেল। বিমাতা আমাকে একছড়া সোণার হার উপহার দিলেন। রমেশ দাদার নিকট হইতে একটা রূপার সুদৃশ্য পাউডার কৌটা উপহার আঁসিল। মাষ্টার মহাশয় বোধ হয় দিয়াছিলেন একখানা রবীন্দ্রনাথের কাব্য।

আমি ছোটগল্প ও কবিতা লিখিতে শিখিয়াছিলাম। রমেশ দাদা তাহা পড়িয়া খুব প্রশংসা করিলেন। তিনি বলিলেন "মুকুলকে দিয়ে মাসিক কাগজে এগুলো ছাপিয়ে দাও।—এ ত বেশ সুন্দর হয়েছে। আজকাল মেয়েদের কি রাবিস্ লেখা বের হয়!"

আজকাল রমেশ দাদাও আমাদের সঙ্গে থিয়েটারে যাইতেন। নন্দদাদা এখন ফুটবল ও ক্রিকেট খেলায় মাতিয়াছিল, সে আর বড় একটা যাইত না। বিশেষতঃ সে বেচারা নাটকের সাহিত্যের দিকটা কিছুই বুঝিত না এবং অভিনয়ের মধ্যে যে আর্ট আছে, তাহাও তার উপলব্ধি হইত না। ষ্টেজের উপরে যুদ্ধ-বিগ্রহ, নাচ-গান—সাজ-পোষাক এসব জমকালো রকমের হইলেই সে খুসী হইত।

তখন থিয়েটারে একটা পরিবর্ত্তন আসিতেছিল। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভদ্র যুবকেরা থিয়েটারে যোগ দিয়া তাহার মধ্যে শিল্প-কলার বিকাশ করিতে অগ্রসর হইলেন। রমেশ-দা ও মুমুল-দা এই অভিনব আর্টিষ্টদের মর্য্যাদা বুঝিতেন এবং তাহাদের খুব প্রশংসা করিতেন। রমেশদার নিকট অনেক অভিনেতা, অভিনেত্রীদের নাম ও পরিচয় আমি জানিলাম। এমন কি তাহাদের

ভিতরের জীবন কাহিনীও তিনি আমাকে কিছু কিছু শুনাইলেন—যাহা মুকুলদার ও অজ্ঞাত ছিল।

দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিবার দুই বৎসর পরে আমার পিতার একটী পুত্র সন্তান হয়। ইতিমধ্যে তিনি ওকালতী ব্যবসায় সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এই বৈমাত্রেয় ভাইটীকে আমি অতিশয় স্নেহ করিতাম; কিন্তু তাহার জন্য পৃথক আয়া ও দাসী নিযুক্ত হওয়ায় আমি তাহাকে সর্ব্বদা কোলে নিতে পারিতাম না। সন্তান প্রসবের পর বিমাতার শরীর অসুস্থ হইয়া পড়িল। বাবা তাঁহাকে লইয়া বিব্রত হইলেন। বড় বড় ডাক্তার-কবিরাজ নিত্য আসিতে লাগিল। আট নয় মাস পরে বিমাতা একটু সুস্থ হইলেন বটে, কিন্তু শরীরের দুর্ব্বলতা দূর হইল না।

আমার পিতার কোন কোন বন্ধু এবং আমার পিসিমা অনেকবার বাবার নিকট আমার বিবাহের কথা উত্থাপন করিয়াছিলেন, আমার কাণে তাহা আসিয়াছে। বাবা বলিলেন এত অল্প বয়সে মেয়ের বিয়ে দিব না। ম্যাট্রিক্ পাশ করুক। তার পর দেখা যাবে।" পিসিমা ও পিতার বন্ধুগণ ইহার উত্তরে যাহা বলিয়াছিলেন, সে সমস্ত এখানে উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। আজকাল খবরের কাগজে এ বিষয়ে নানা বাদ প্রতিবাদ ও তর্কবিতর্ক আপনারা পাঠ করিয়া থাকেন।

আমার যৌবনোদ্ভব হইয়াছিল। অভিভাবকের অসাবধানতায় ও অনুকূল পবনে যথাসময়ে আমার হৃদয়ের মধ্যে প্রবৃত্তির অনল জ্বলিয়া উঠিল—তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম। বিবাহের জন্য মনে মনে আমার আকাঙ্ক্ষাও হইত।

তৃতীয়

পলায়ন

বেথুনে পড়িবার সময় আমার তিনটী অন্তরঙ্গ বালিকা বন্ধু লাভ ঘটিয়াছিল। তন্মধ্যে কমলার পরিচয় একটু বিশেষভাবে দিব। কারণ তাহার জীবনের সহিত আমার জীবন এক অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে জড়িত। বাল্যকালের কোন বন্ধুর সহিত এখন আর দেখা হয় না। অনেককেই ভুলিয়া গিয়াছি। কিন্তু কমলাকে এখনও ভুলিতে পারি নাই। সেও আমাকে হয়ত ভুলে নাই। আজ এই আত্মচরিত লিখিবার সময়ে তাহার কথা প্রতিমুহূর্ত্তে আমার মনে হয়—অতীত জীবনের সুখ দুঃখের কত কথা আজ মনে হইতেছে।

কমলা পরমা সুন্দরী ছিল—ছিল কেন, এখনও বোধ হয় আছে। নারীর সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে পুরুষেরা বলিয়া থাকে,—"স্ত্রীলোক কুড়ি পার হইলেই বুড়ি।" একথা সকলের সম্বন্ধে খাটেনা। কুড়ির পর আরও কুড়ি বৎসর চলিয়া গিয়াছে, তবু এমন নারী হিন্দুসমাজে যথেষ্ট আছে, যাহাদের সৌন্দর্য্য ভাদ্রের ভরানদীর মত ঢল ঢল, শরতের জ্যোৎস্নার ন্যায় অনাবিল, তাহাতে মলিনতার লেশ মাত্র নাই। আমি নিজে নারী হইয়া নারীর রূপে আকৃষ্ট হইয়াছি, শুনিয়া হয়ত আপনারা হাসিবেন।

শুধু রূপে নহে, গুণেও কমলা আমার চিত্তকে মুগ্ধ করিয়াছিল। তাহার ভালবাসা ও সহানুভূতি আমি চিরদিন সমভাবে পাইয়াছি। আমোদ-প্রমোদে, গান-বাজনায়, হাস্য-পরিহাসে, খেলা-ধূলায়, লেখা-পড়ায় সকল বিষয়ে তাহার সমান অধিকার ছিল। স্কুলের প্রাইজ্ ডিষ্ট্রীবিউসন (পুরস্কার বিতরণ) অথবা অন্য কোন উৎসবের আয়োজনে কমলার সাহায্য না লইলে চলিত না। সে মেয়েদের গান ও অভিনয় শিখাইত।

একবার কোন বালিকা বিদ্যালয়ের গৃহ নির্ম্মাণের জন্য অর্থ সংগ্রহ চেষ্টায় ইউনিভারসিটি ইন্‌ষ্টিটিউটে নানাবিধ আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা হয়। আমার রমেশ-দা তাহাতে একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। সেই উপলক্ষে বোধ হয় বেথুন, ডায়োসিসান, প্রভৃতি বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা মিলিয়া নবীন সেনের 'কুরুক্ষেত্র' কাব্য হইতে নির্ব্বাচিত দৃশ্যের অভিনয় করে। তাহাতে আমি 'শৈলজার' অংশ লইয়াছিলাম, কমলা নিজে 'জরুৎকার' সাজিয়াছিল। আমাদের অভিনয় দেখিয়া দর্শকগণ চমৎকৃত হইয়াছিলেন। শৈলজার দু'টী গান আমার মাষ্টার মহাশয় রচনা করিয়া দিয়াছিলেন। কমলা তাহাতে সুর যোজনা করিয়া আমাকে শিখাইয়াছিল। অর্জ্জুনের প্রেমলাভে নিরাশ শৈলজার অন্তরের ব্যাথা সেই গানে ফুটিয়া বাহির হইয়াছিল। সেই গান এখনও মাঝে মাঝে গাহিয়া আমি শান্তি পাই।

কমলা বৈদ্য বংশের মেয়ে। কলিকাতায় বাগ্‌বাজারে একখানা সাধারণ দোতালা বাড়ীতে সে তাহার মাতার সহিত বাস করিত। কমলার পিতা কার্য্যোপলক্ষে নানাস্থানে ঘুড়িয়া বেড়াইতেন। মাঝে

মাঝে দুই এক মাস বা দশ পনরদিন কলিকাতায় আসিয়া থাকিতেন। কমলার একটী ছোট ভাই স্কুলে পড়িত। সে কমলার অপেক্ষা ছয় বৎসরের ছোট ছিল।

বাড়ীখানা কমলাদের নিজের। সুতরাং তাহার পিতা মাসিক যে দুইশত টাকা পাইতেন, তাহাতে তাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহ স্বচ্ছন্দে হইয়া যাইত।

আমি কমলাদের বাড়ী অনেকবার গিয়াছি। তাহার মাতা অতি শান্ত-স্বভাবা ও স্নেহশীলা। তিনি আমাকে আদরের সহিত কত সুমিষ্ট খাদ্য আহার করাইতেন। আমি মাতৃস্নেহে বঞ্চিত ছিলাম বলিয়া সহজেই কমলার মায়ের বিশেষ অনুগত হইয়া পড়িলাম। তিনি সর্ব্বদাই আমাকে বলিতেন "তুমি আমার কমলার ছোটবোন।" কমলা বয়সে আমার দুই বৎসরের বড় ছিল।

কাশীতে কমলার পিতার এক বন্ধু বাস করিতেন। তাঁহার চেষ্টায় এক যুবকের সহিত কমলার বিবাহ হয়। উহা দুই বৎসর পূর্ব্বের কথা। কমলা তখন আমদের সঙ্গে তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ে। যুবকটী কাশীতেই চাকরী করিত—তাহার পিতামাতাও সেখানে থাকিতেন। গ্রীষ্মের ও পূজার ছুটীতে কমলা কাশীতে স্বামীর কাছে যাইত। কমলা ও তাহার স্বামীর মধ্যে যে সকল চিঠীপত্র চলিয়াছে, তাহা সমস্তই আমি দেখিয়াছি। আমরা দুইজনে গোপনে বসিয়া তাহাদের কত অর্থ বিশ্লেষণ করিতাম।

আমাদের সহপাঠী বন্ধুদের মধ্যে এই সব চিঠি লইয়া কত হাস্য পরিহাস চলিত। আমার আরও দুই তিনটী বিবাহিতা বন্ধু-ছিলেন। তাহাদের স্বামী-প্রেমের ভিতরের রহস্যও আমি

জানিতাম। প্রথম প্রণয়-সম্ভাষণ, বাসর রজনী যাপন, মান-অভিমানের অভিনয়, পুরুষের ব্যবহার প্রভৃতি বিষয় লইয়া আমাদের মেয়ে মহলে নিত্য আলোচনা হইত। এই সকলের মধ্যে আমি আমার ছোট্ট গল্পের প্লট্ ও কবিতার উপাদান পাইতাম। তাই মুকুলদা আমাকে বলিতেন "মানু, তোমার গল্পে ও কবিতায় আমি রিয়্যালিষ্টিক আর্টের গন্ধ পাচ্ছি।"

প্রায় আট নয় মাস হইল, কমলার সহিত তাহার স্বামীর বিচ্ছেদ ঘটিয়ায়াছে। ইহার কারণ বড় ভয়ানক। কমলার শ্বশুর কিরূপে শুনিয়াছেন, কমলার মাতা কমলার পিতার বিবাহিতা পত্নী নহে—রক্ষিতা মাত্র। সুতরাং জানিয়া শুনিয়া পতিতা নারীর কন্যাকে তিনি পুত্রবধূ রূপে গৃহে রাখিতে পারেন না। তিনি লিখিয়া জানাইয়াছেন—কমলাকে আর তিনি গ্রহণ করিবেন না।—পুত্রের পুনর্ব্বার বিবাহ দিবেন। তিনি আরও ভয় দেখাইয়াছেন, যদি কমলা ভরণ-পোষণের দাবী করে, তবে আদালতে তিনি সমস্ত কলঙ্কের কথা প্রকাশ করিয়া দিবেন, এবং প্রতারণার অভিযোগ করিয়া কমলার পিতার বিরুদ্ধে পাল্‌টা মোকদ্দমা আনিবেন।

এই ব্যাপার উপলক্ষে কমলার স্বামী যে কয়েকখানা পত্র তাহার নিকট লিখিয়াছিলেন তাহা বড়ই করুণ। তিনি কমলাকে অতিশয় ভালবাসিতেন। কমলাও তাহার স্বামীর প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিল। কে যেন দারুণ খড়্গাঘাতে ইহাদের প্রেমের বন্ধন ছিন্ন করিয়া দিল। কমলার স্বামী লিখিয়াছেন—"কি করব—তোমার কোন অপরাধ নেই জানি কিন্তু আমি পিতার অবাধ্য হ'তে পারি নে। আমায় ক্ষমা কর কমল। ধর্ম্মসাক্ষী করে

তোমায় পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলাম—আবার ধর্ম্মের মুখ চেয়েই তোমায় পরিত্যাগ কর্‌ছি। অগ্নি পরীক্ষার পরও রামচন্দ্র কলঙ্কিত পত্নীকে নিয়ে গৃহধর্ম্ম পালন কর্‌তে পারেন নি। সীতার মত পত্নীকে বিসর্জ্জন কর্‌তে হয়েছিল। এখন বিদায়, আমার ভালবাসা তুমি চিরদিন পাবে—কিন্তু পত্নীরূপে নহে।”

এই পত্রের উত্তর আমিই কমলাকে লিখিয়া দিয়াছিলাম। পত্রের উত্তর দিবার কমলার ইচ্ছা ছিল না। তার প্রাণে বড় আঘাত লাগিয়াছিল। বাহিরের আমোদ প্রমোদে সে তাহা ভুলিবার চেষ্টা করিত কিন্তু আমি তাহার হৃদয়ের অন্তস্থল পর্য্যন্ত দেখিতাম। আমার অনুরোধে ও উপদেশে কমলা শেষে এইরূপ লিখিল—“তুমি যাহা সিদ্ধান্ত করেছ, তাহা অটল থাকুক। তোমার পিতৃভক্তি যেন বিচলিত না হয়। তুমি ভারতের আদর্শ গৌরব দেখিয়ে যে দৃষ্টান্ত দিয়েছ, তাহার শেষ চিত্র তোমার চোখে পড়েনি। পরশুরামের প্রায়শ্চিত্ত—ভীষ্মের শরশয্যা—রামচন্দ্রের বিলাপ তুমি ভুলে গিয়েছ। পিতৃভক্ত মাতৃঘাতী কুঠার হস্ত-মুক্ত করবার জন্য পরশুরামকে দীর্ঘকাল তীর্থ ভ্রমণ কর্‌তে হয়েছিল, পিতৃভক্তি তাকে রক্ষা করতে পারে নি। প্রেমে প্রত্যাখ্যাতা অম্বার তপস্যা ভীষ্মের ক্ষাত্রশক্তিকে নপুংসকের হস্তে পরাভুত করেছিল, পিতৃভক্তি তাহাকে রক্ষা কর্‌তে পারে নি। এ জগতে প্রত্যেক কর্ম্মের ফল পৃথক পৃথক ও স্বাধীন।”

“একের দ্বারা অন্যের প্রতিরোধ হয় না। তোমায় উপদেশ দেওয়া আমার কর্ত্তব্য নহে। প্রগল্‌ভতা ক্ষমা করো। তুমি মহৎ—তাই আমার পরিত্যাগ করেও চিরদিন

ভালবাসবে বলছ, কিন্তু আমি তোমার মত মহৎ নই—আমি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র—স্রোতে ভাসিয়া চলিলাম, জানিনা কোথায়।”

কমলার এই পত্রেরও উত্তর আসিয়াছিল। তাহাতে তাহার স্বামী লিখিয়াছিলেন “কমল আমার অপরাধ বুঝেছি। প্রায়শ্চিত্তের দিন এলে মাথা পেতে শাস্তি গ্রহণ করব। তখন যেখানেই থাক হতভাগ্যকে একবার মনে করো।” বুঝিলাম কমলার স্বামীর প্রাণ আছে। সে যথার্থ :দরদী, কিন্তু অবস্থার দাস। সমাজের কৃত্রিমতার আঘাতে এমন কত হৃদয় স্বভাবের পথে পরিচালিত হইতে পারে না। সমাজ-বিধি এমনি করিয়া মানব জীবনের পরিস্ফূর্ত্তির পথে অন্তরায় হয়।

কমলার মায়ের সম্বন্ধে যে কলঙ্কের কথা রটিয়াছিল, তাহা কতদূর সত্য আমি তাহার অনুসন্ধান করি নাই। পদ্মফুলের মুল থাকে কাদায়—সূর্য্য তাহার খোঁজ রাখে না। সে জলের উপরে ফুলটীকে ফুটাইয়া সুখী হয়—বাতাস তাহাকে দোলায়—ভ্রমর তার মধুপান করে।

কমলা আমাদের বাড়ীতে প্রায়ই আসিত। আমার পিতাও তাহাকে স্নেহ করিতেন। মাস্টার মহাশয়, আমি, কমলা ও রমেশ দাদা মাঝে মাঝে মোটরে বেড়াইতে যাইতাম। কমলাদের বাড়ীতে আমাদের চা-পার্টির নিমন্ত্রণ হইত। কমলার মাতা ধনীর গৃহিণী না হইলেও আমাদের আদর যত্নের ক্রটী হইত না। তিনি স্বহস্তে সমস্ত খাবার প্রস্তুত করিতেন।

আমি যে সকলের সঙ্গে এরূপ অবাধ মেলা মেশা করিতাম,

ইহাতে পিতার কোন আপত্তি ছিলনা। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তিনি সামাজিক ব্যাপারে উদার মত পোষণ করিতেন। আমাদের বাড়ীর পশ্চাতে খানিকটা মাঠের মত জায়গা ছিল। আমি বাবাকে বলিয়া সেখানে একটী টেনিস্-কোর্ট্ তৈয়ারী করাইলাম। নন্দ-দাদা এ-বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগী হইল। রমেশ-দা' মুকুল-দা, কমলা, আমি, নন্দলাল এবং আরও কয়েক জন বন্ধু বৈকালে এই মাঠে টেনিস্ খেলিতাম। মুকুল-দা খেলা কিছুই জানিতেন না—তাঁহাকে অনেক ধরিয়া বাঁধিয়া শিখাইয়া লইলাম। কমলা খেলায় খুব নিপুণ ছিল। সে সর্ব্বদাই আমার প্রতিদ্বন্দ্বী থাকিত। রমেশ-দাও মুকুল-দা কখনও আমার পক্ষে কখনও কমলার পক্ষে খেলা করিত।

বিমাতা আমাদের সংসারে আসিবার সময় পিত্রালয় হইতে একটী দাসী আনিয়াছিলেন। তাহার নাম ছিল হরিমতি। তাহাকে ঝিয়ের কাজকর্ম্ম কিছুই করিতে হইত না। সে ছিল অনেকটা আমার বিমাতার পার্সন্যাল এসিষ্ট্যাণ্ট বা প্রাইভেট্ সেক্রেটারী। তাহার বয়স প্রায় ৪৫।৪৬ হইবে। বোধ হয়, সে বিধবা—থান কাপড় পড়িত, হাতে নোয়া ও সিঁথিতে সিন্দুর দিত না, তাহার গলায় একছড়া সরু বিছাহার ও হাতে চারিগাছি সোণার চূড়ি ছিল। সে একাদশীর উপবাস করিত, মাথায় গন্ধ তেল মাখিত ও চব্বিশ ঘণ্টা দোক্তা দেওয়া পান চিবাইত। চাকর বেচারাদের উপর যে তা'র কটাক্ষপাত না হইত এমন নহে।

বাড়ীর এক নিভৃত কোণে হরিমতি তার শোবার ঘর ঠিক্ করিয়াছিল। উহা সে প্রয়োজন মত সাবধানে তালাচাবি দিয়া বন্ধ করিয়া রাখিত। দুপুর বেলা সে ঐ ঘরে যাইয়া ঘুমাইত। তার

নিজের কোন নির্দ্দিষ্ট কাজ না থাকায় অপর সকলের কাজের উপর ওস্তাদি করিয়া বেড়াইত—আর খামাকা কথা তুলিয়া কেবলি গোলযোগ পাকাইত।

আমার এই রকম চাল-চলন হরিমতি দুই চক্ষে দেখিতে পারিত না। সে প্রথমে বিমাতার নিকট আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিল। কিন্তু বিমাতা আমার প্রায় সম-বয়সী, বিশেষতঃ মায়ের মত গাম্ভীর্য্য ও শাসন করিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। তিনি রুক্ষভাষিণী ও কোপন স্বভাব নহেন। সুতরাং তিনি আমায় কিছুই বলিলেন না। বিফল মনোরথ হইয়া হরিমতি বাবার কাছে গেল ; কিন্তু সেখানেও কোন সুবিধা হইল না।

অবশেষে সে নিজেই আমাকে শাসন করিতে আরম্ভ করিল। একদিন হরিমতি আমাকে বলিল "আচ্ছা, খুকুমণি এসব কি বলত! পাড়াময় লোকে ছিছি কচ্ছে। জ্ঞাতি ভাই আছে—মাষ্টার আছে, বেশ তাদের সঙ্গে সভ্য ভব্য হয়ে কথা কও—হাস্‌তে হাস্‌তে পুরুষের গায়ে ঢলে পড়া—গলাগলি হ'য়ে বেড়ান! তুমি সোমত্ত মেয়ে—বিয়ে হ'লে এদ্দিনে ছেলের মা হ'তে।"

হরিমতি যাহা বলিয়াছিল তাহা মিথ্যা নয়, এজন্য আমি কোন উত্তর দিলাম না। মাথা নীচু করিয়া রহিলাম। ঝগড়া করা আমার স্বভাব নহে। বিশেষতঃ এক্ষেত্রে বাদ প্রতিবাদ আমার পক্ষে সুবিধাজনক হইবে না, তাহা আমি জানিতাম। ঘটনা যে পাড়াময় ছড়াইয়াছে, একথা হরিমতি আমাকে ভয় দেখাইবার জন্য বলিয়াছিল। তবে ইহাও আমি জানিতাম, যদি আমার কখনও বদ্‌নাম রটে, তবে তাহা হরিমতি দ্বারাই হইবে।

কিছুদিনের মধ্যেই আমার ধারণা সত্যে পরিণত হইল। হরিমতি যখন দেখিল মুখের কথায় শাসাইয়া আমাকে জব্দ করিতে পারিল না, তখন সে পাড়াময় আমার বদনাম রটাইতে লাগিল। কথা ক্রমশঃ বাবার কাণে উঠিল, তিনি বিশ্বাস করিলেন না। তিনি সংবাদ-দাতাকে বলিলেন, "আমাদের দেশের মেয়েরা স্বাধীনভাবে চলাফেরা করিলে অমনি সাধারণ লোক নানা মিথ্যা কলঙ্কের কথা রটায়। কারণ—এদেশে স্ত্রী-স্বাধীনতা চলিত নহে।"

আমার জেদ বাড়িয়া উঠিল। মুকুল দাদা আমাকে একদিন কথা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, "প্রেমের পথে যতই বাধা বিঘ্ন আসে, ততই উহা প্রবল হয়।" ইহার প্রমাণ আমি আমার হৃদয়ের মধ্যে পাইতে লাগিলাম।

আমার প্রথম যৌবনের উদ্দাম আকাঙ্খা প্রাণের মধ্যে জাগিয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে সম্মুখে দেখিলাম দুইটী যুবক—মুকুল ও রমেশ। প্রকৃতির নিয়মে ইহাদের দিকে প্রবৃত্তির প্রবাহ প্রবল বেগে ছুটিল। আমাকে টানিয়া রাখিবার জন্য শাসন, মাতৃস্নেহ, আদর-যত্ন ছিল না। আজ মনে হয়, আমার মা বাঁচিয়া থাকিলে হয়ত এ-পথে আসিতাম না। আমার বাবা যদি একদিনও একটু আদর করে আমার দিকে মুখ তুলিয়া চাহিতেন, অথবা শাসন করিতেন তবে বোধ হয় এ জীবনের গতি ফিরিয়া যাইত।

মুকুলদা একটু ভীরু স্বভাব। রমেশ-দা ছিল সাহসী ও বেপরোয়া। একদিন দুপুর বেলা বাবা বৈঠকখানা ঘরে বসিয়া পড়িতেছিলেন। আমাদের স্কুল ছুটি। আফিসও বন্ধ। রমেশ-দা আসিয়া বাবাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কাকাবাবু, মানী কোথায়?"

বাবা বলিলেন উপরে আছে—কেন ?” রমেশদা বলিলেন “আজ আমরা বোটানিক্যাল গার্ডেনে বেড়াতে যাব, মানী যদি যায়, তবে কাকীমাকে শুদ্ধ নিয়ে যাব।” বাবা বলিলেন “যাও জিজ্ঞেস্ করে এস।”

রমেশ-দা একবারে আমার শোবার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমি অর্দ্ধ শয়ান অবস্থায় গীতগোবিন্দের একটা কবিতা পড়িতেছিলাম। তিনি পালঙ্কের উপরে আমার পাশে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “মানী আজ বোটানিক্যাল গার্ডেনে যাবে ? —চল।” আমি বলিলাম, “না রমেশদা, আজ শরীরটা ভাল নয়।” রমেশদা আমার কপালে হাত দিয়া কহিলেন “কৈ, কিছুইত নয় ! দেখি হাত !” তিনি আমার বাম হাত খানি টানিয়া নাড়ী টিপিয়া বলিলেন “কিছুনা—তোমার সব চালাকী ! তিনি আমার আঙ্গুলের ফাঁকে ফাঁকে তাঁহার আঙ্গুলগুলি প্রবেশ করাইয়া পাঞ্জা ধরার মত আমার হাত টিপিতে লাগিলেন। আমার সমস্ত দেহে বিদ্যুৎ-তরঙ্গের মত এক অপূর্ব্ব পুলকের সঞ্চার হইতেছিল।

আমি কাত হইয়া ফিরিয়া শুইলাম। একটু মুচ্‌কি হাসিয়া বলিলাম, “নাড়ী টিপিয়া আর কপালে হাত দিয়াই বুঝি সব ব্যারাম ধরা যায়।” রমেশ-দা এই পরিহাসের অর্থ বুঝিয়া বলিলেন “তবে আমাকে বিনা ষ্টেথিস্‌কোপেই পরীক্ষা করতে হয়।”

* * * *

কিছুক্ষণ পরে রমেশ-দা বাহির হইয়া গেলেন। হিংস্র ব্যাঘ্র যেমন রক্তের স্বাদে উন্মত্ত হয়, আমিও তেমনি হইলাম।

আমার মনে কিছুমাত্র ভয় বা অনুতাপ আসিল না। বরং আশঙ্কা ও সঙ্কোচ কাটিয়া গেল। বুঝিলাম ইচ্ছা থাকিলে সুযোগের অভাব হয় না।

ছয় সাত মাস চলিয়া যায়। আমি প্রবৃত্তির অনলে ইন্ধন দিতেছি। রমেশ-দা তখনও বোর্ডিংএ থাকেন। নানা অছিলা দেখাইয়া পরিবার আনেন নাই। মুকুলদা কমলার প্রতি আসক্ত হইয়াছিলেন। তিনি ব্রাহ্ম মতে কমলাকে বিবাহ করিতে সম্মত, এইরূপ ভাবও দেখাইয়াছেন। আমি তাহাতে সন্তুষ্ট হইলাম। কমলা কিন্তু তখনও দূরে দূরে—সে তার পূর্ব্বের স্বামীকে এত শীঘ্র ভুলিতে পারে নাই।

একদিন রমেশ-দা আমার নিকট প্রস্তাব করিল, আর ত এ বাড়ীতে হ'তে পারে না। এমন স্থানে চল, যেখানে নিত্য তোমায় দেখ্‌ব—প্রতিমুহূর্ত্তে তোমায় প্রাণের কাছে রাখ্‌তে পারব। পাথরের পাহাড় চুরমার করে যখন নদীপ্রবাহ একবার বেরিয়েছে, তখন চল একবারে মুক্তপ্রান্তরে যেয়ে পড়ি। আমি কোন উত্তর না দিয়া রমেশ-দার গলা জড়াইয়া তাঁর বুকে মাথা লুকাইয়া কাঁদিয়া ফেলিলাম।

আমাদের বার্ষিক পরীক্ষা নিকটবর্ত্তী হইয়াছিল। বাড়ীতে সকালবেলা অধিকক্ষণ পড়িবার জন্য আমি বাবাকে বলিয়াছিলাম যে এখন স্কুলের গাড়ী প্রথম ট্রিপেই নয়টার সময় আমাকে নিতে আসে; অথচ ক্লাস বসে সাড়ে দশটায়। বহু সময় আমার বৃথা নষ্ট হয়। বাবা বলিলেন, "বাড়ীর মোটরত মেরামত করতে দেওয়া হয়েছে। যতদিন না আসে ততদিন ট্যাক্সি করে যেও।

নন্দলাল আর তুমি এক সঙ্গে যাবে। আগে তোমাকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে তারপর নন্দকে দিয়ে আস্‌বে। পরদিন হইতে আমি ও নন্দ-দা টাক্সিতে স্কুলে যাইতাম। আসিবার সময় নন্দলাল আগে ট্যাক্সি করিয়া আসিত। আমি তাহার জন্য স্কুলে অপেক্ষা করিতাম।

দুই তিন দিন যাবৎ আমার মাঝে মাঝে বমি হইতেছে। মুখ দিয়া কেবল থুতু উঠে। রমেশদা শুনিয়া একটু স্তব্ধ হইলেন। পরদিন তিনি আসিয়া বলিলেন "মানী, আমি চার মাসের ছুটী নিয়েছি। চল পশ্চিমে যাই। আর বেশী দেরী করোনা। কাল স্কুলে যাবার সময় নন্দকে আগে নামিয়ে দিয়ে তুমি ট্যাক্সি নিয়ে একেবারে আমার বাসায় যেও। আমি সব জিনিষ পত্র গুছিয়ে ঠিক করে রাখ্‌ব। যা যা কেনবার প্রয়োজন, মুকুলকে টাকা দিয়েছি।" আমার প্রাণ আনন্দে অধীর হইল।

মুকুলদা নিয়মিত সময়ে পড়াইতে আসিতেন। আমার সহিত রমেশ-দার প্রণয়ের কথা মুকুলদার নিকট গোপন ছিল না। এই উপলক্ষে তাঁর কত নূতন কবিতা রচিত হইয়া গেল—'মাধুরী' নামে আর একখানি কাব্যগ্রন্থ লেখা হইল।

পরদিন যথাসময়ে আমি ও নন্দ-দা ট্যাক্সি চড়িয়া স্কুলে রওয়ানা হইলাম। আমি পুস্তক অথবা খাতা কিছুই নিলাম না। নন্দদাকে বুঝাইলাম, "এখন পরীক্ষার জন্য আমাদের পুরানো পড়া রিভাইজ্‌ হচ্ছে, বই নিয়ে কি হবে!" গাড়ীতে উঠিয়া নন্দ-দা তাহার রিষ্ট্‌ ওয়াচের দিকে চাহিয়া বলিল, "ওঃ—মানু আমার বড্ড দেরী হয়ে গেছে।" আমি বলিলাম "তাহলে নন্দদা, তুমি আগে নেমে যাও,

আমার একটু পরে গেলেও ক্ষতি নাই!” এমনি করিয়াই অপ্রত্যাশিত সুযোগ আসিয়া জোটে। আমি ভাবিতেছিলাম নন্দদাকে কি বলিয়া আগে নামাইবার ব্যবস্থা করি। সাধুর সৎকার্য্যের বুদ্ধি যিনি প্রেরণ করেন, চোরের মাথায় ফিকির ফন্দিও তিনিই যোগান।

নন্দ-দাকে তাহার স্কুলে নামাইয়া দিয়া আমি একেবারে সোজা-সুজি রমেশদার বাসায় উপস্থিত। দেখিলাম সেখানে মুকুল-দাও রয়েছেন! রমেশ-দা একটা সুট্‌কেশ লইয়া আমার সহিত অন্য এক ট্যাক্সিতে উঠিলেন। মুকুল-দার নিকট এইখানেই বিদায় নিলাম। তাড়াতাড়িতে কমলাকে কিছুই জানান হয় নাই। মুকুল-দাকে বলিলাম, তিনি যেন কমলাকে সকল বিষয় খুলিয়া বলেন। ট্যাক্সী হাওড়া ষ্টেশনের দিকে অগ্রসর হইল। পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলাম, মুকুল-দা রুমালে চক্ষুর জল মুছিতেছেন।

বাড়ী হইতে বাহির হইবার পূর্ব্বে একবার মনে হইয়াছিল, যাইবার সময় মায়ের ছবিখানিকে প্রণাম করিয়া যাইব। কিন্তু মানসিক উদ্বেগে সে কথা ভুলিয়া গেলাম। ভালই হইয়াছে বলিতে হইবে, কারণ মায়ের ছবির প্রতি দৃষ্টি পড়িলে বোধ হয়, এতবড় জঘন্য দুঃসাহসের কার্য্য করিতে পারিতাম না।

আমরা একটা লোক্যাল ট্রেণে বর্দ্ধমান যাইয়া কিছুক্ষণ থামিলাম। তার পর সন্ধ্যায় লাহোর এক্‌সপ্রেসে একেবারে দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

চতুর্থ

ভুল ভাঙ্গিল

আমি ঘর ছাড়িলাম কেন?—এই প্রশ্নের উত্তর খুব স্পষ্ট-ভাবেই দিব। প্রবৃত্তির উত্তেজনায় মোহাচ্ছন্ন ও হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া আমি গৃহ পরিত্যাগ করিয়াছি। শরীর-ধর্ম্মের স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে যে বয়সে আমাদের যৌবন চাঞ্চল্য দেখা দেয়, তখন বিবাহ সংস্কারের দ্বারা তাহাকে সংযত করিবার ব্যবস্থা সমাজে আছে। বালক বালিকাদিগকে সুশিক্ষায় নিরত এবং সর্ব্বদা সৎসঙ্গে রাখিলে এই যৌবন চাঞ্চল্য অল্প বয়সে আসিতে পারে না। কিন্তু আমাদের সমাজে বর্ত্তমান সময়ে সুশিক্ষা ও সৎসঙ্গরই অভাব। তাহার ফলে তরুণ হৃদয়ে অকালে যৌবন সম্মেলনের উদ্দাম কামনা জাগ্রত হইয়া উঠে।

আমি সুশিক্ষা ও সৎসঙ্গ কিছুই পাই নাই। স্কুলে শিক্ষার ফলে কাব্য কবিতা গল্প উপন্যাস প্রভৃতি তরল সাহিত্যই পড়িতে শিখিয়াছি। তাহাতে আমার হৃদয়ে কল্পনার উত্তেজনায় দুস্প্রবৃত্তিই সকলের আগে মাথা তুলিয়া উঠিয়াছে। সদ্‌গ্রন্থ কখনও পড়ি নাই—যাহাতে সংযম শিক্ষা হয়, যাহাতে ধর্ম্মভাবের উদয় হয় এমন কোন পুস্তক কেহ আমার হাতে দেয় নাই। আমোদ প্রমোদ যাহা ভোগ করিয়াছি, তাহা সমস্তই অতি নিম্ন স্তরের। থিয়েটারে নাচ গান, সিনেমার চিত্র কখনও হৃদয়ে সদ্ভাব

জাগ্রত করে নাই। অল্প বয়স্কদের পক্ষে তাহা হইতে শিক্ষা লাভের চেষ্টা বিপদ্‌জনক। দুই একটা দাঁত উঠিলেই যদি শিশুকে মাছ খাইতে দেওয়া যায়, তবে সে যেমন গলায় কাঁটা বিঁধিয়া মৃত্যু মুখে পতিত হয়; থিয়েটার দেখায় ও নভেল পাঠেও দেশের তরুণ তরুণীদের সেই মরণদশা ঘটিতেছে। আমার নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে এই কথা বলিতেছি। আমার মত যাহারা আছে তাহারাও ইহার সমর্থনে সাক্ষ্য দিবে।

বেথুন স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়াই আমার মনে হইয়াছিল আমি খুব জানি। তরুণ সাহিত্যিকদের গল্প উপন্যাস যথেষ্ট পড়িয়াছিলাম; বিশেষতঃ মুকুলদার অনুগ্রহে সেলী, বায়রণ, সেক্সপীয়ার, বিদ্যাপতি, ভারতচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র, বঙ্কিম, দীনবন্ধু, গিরিশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির পুস্তক ও কিছু কিছু অধ্যয়ন করিয়াছিলাম। সুতরাং অহঙ্কার যে আমাকে ফুলাইয়া তুলিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি!

যাহারা কেবল কল্পনাময় রাজ্যে বিচরণ করে, সংসারের কঠোর সত্য সম্বন্ধে তাহাদের কোন জ্ঞান জন্মে না। কবি ও সাহিত্যিকেরা এই রকম ধরণের লোক। তাঁহারা শুধু চিন্তা লইয়া খেলা করেন, কর্ম্মের ধারেও ঘেঁসেন না। মুকুলদার শিক্ষায় আমার এই দশা হইয়াছিল। কাব্য কবিতা ও নাটক নভেলের মধ্য দিয়া সংসারকে কল্পনার চক্ষে যেমন দেখিয়াছি, প্রকৃত কর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়া দেখিলাম সে সমস্তই মিথ্যা।

আমি যখন গৃহত্যাগ করি তখন আমার বয়স পনর বৎসর। এই বয়সে যদি আমি আমাকে নিঃসহায় ও বুদ্ধিহীনা মনে করিতাম,

যদি ভাবিতাম যে আমি ত সংসারের কিছুই জানিনা—যদি আমার পদে পদে ভয় হইত, তবে আমি কখনই এমনভাবে বাহির হইতাম না। কিন্তু একটা মিথ্যা গর্ব্ব আমাকে দুঃসাহসী ও দূরদৃষ্টিহীন করিয়া তুলিল। আজ মনে হয়, আমি যদি উপযুক্ত অভিভাবকের অধীন থাকিতাম, তবে আমার ভাল হইত। স্বাধীনতার মধ্যেও যে পরাধীনতার প্রয়োজন আছে, তাহা এখন বুঝিয়াছি।

ভাবিয়াছিলাম, ঘরের বাহির হইলেই বুঝি সকল বাধা দূর হইয়া যাইবে—প্রবৃত্তির ভোগ একেবারে পূর্ণমাত্রায় চালাইতে পারিব। কিন্তু দিল্লীতে পৌঁছিয়া দেখিলাম, ব্যাপার বড় গুরুতর। পুলিশের ভয়—আমাদিগকে লুকাইয়া থাকিতে হইবে। বিদেশে, লোকজন সমস্তই অচেনা। আমরা বাঙ্গালী, কোথায় যাই কোথায় থাকি, কি খাই। রমেশ-দা বাহিরে গেলে আমি একাকী কিরূপে ঘরে থাকিব! নানারকম সমস্যা—বহুপ্রকারের অসুবিধা। বাড়ীতে যে ইহা অপেক্ষা ছিল। ভাল সেখানেত আরও স্বাধীন ছিলাম—এমন কি রমেশ-দার সহিত গুপ্ত প্রণয়ের সুযোগও ছিল বেশী।

অবশ্য টাকার জোরে সকল অসুবিধাই অতিক্রম করা যায়। কিন্তু রমেশদার কি এত টাকা আছে। আমি ত প্রায় এক বস্ত্রে বাহির হইয়া আসিয়াছি। রমেশ-দা আড়াই হাজার টাকা সঙ্গে আনিয়াছেন। বসিয়া বসিয়া খাইলে ইহাতে কতদিন চলিবে? পশ্চিম ভারতের যে কোন সহরেই থাকি, খুব উঁচু ষ্টাইলে ভাল হোটেলে থাকিতে হইবে। আমার কাপড় চোপড় ও কিছু গহনাপত্র চাই। একটা ছোক্‌রা চাকরের দরকার। আমরা শাকভাত, ডালরুটি খাইয়া সন্ন্যাসীর মত গাছ তলায় থাকিতে নিশ্চয়ই আসি নাই।

আমাদের জীবন ভোগের পূজা, তাহার প্রধান উপকরণ কাঞ্চন।

দিল্লীতে এক সপ্তাহ কাটিয়া গেল; মুকুলদার পত্রে জানিলাম বাবা আমার জন্য খুব অনুসন্ধান করিতেছেন; কিন্তু পুলিশে এজেহার দেন নাই। রমেশ-দার উপর ঘোরতর সন্দেহ হইয়াছে। তাঁহার আফিসে ও বাড়ীতে খবর লওয়া হইতেছে। কমলা অতিশয় দুঃখিত। দিল্লী হইতে লাহোরে গেলাম।

রমেশ-দা পূরা এক বৎসরও চাকুরী করেন নাই। এরই মধ্যে তিনি কিরূপে চারিমাসের ছুটী পাইলেন, একথা কখনও আমার মনে হয় নাই।

কতদিন কাজ করিলে কতদিন ছুটী মিলে—কোন্ আফিসের কি রকম দস্তুর, ইহার খোঁজ খবর কাব্য উপন্যাসে পাওয়া যায় না। আমি ভাবিয়াছিলাম আফিসের কেরাণীরা চাহিলেই ছুটী পায়।

আমরা রেলপথে সেকেণ্ড ক্লাসে ভ্রমণ করি। বর্দ্ধমানে গাড়ীতে উঠিয়া রমেশ-দা স্যুটকেস্ খুলিলেন। আমার সম্মুখে পাঁচ তাড়া নোট্ রাখিয়া বলিলেন "মানু, এই আমাদের সম্বল"। আমি গুণিয়া দেখিলাম প্রত্যেক তাড়ায় ১০০ খানি পাঁচ টাকার নোট্। এই আড়াই হাজার টাকা রমেশ-দা কোথায় পাইলেন তখন ভাবি নাই। মাসিক ২০০ টাকা হিসাবে এক বৎসরের বেতনও আড়াই হাজার হয় না। রমেশ-দা বোধ হয় বড়লোকের ছেলে—বাপের টাকা উড়াইতেছেন। তাওত নয়। আমার পিতার কাছে রমেশ দা চাকুরী প্রার্থী হইয়াছিলেন। অর্থাভাবে মাসাবধি তিনি আমাদের গৃহে অন্ন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এত কথা তখন আমার মনে আসে নাই। কারণ ভোগলালসা যা'র সৃষ্টি, সেই সয়তান সমস্ত ভুলাইয়া রাখে। সুখের স্বপ্নে বিভোর গন্ধর্ব্ব দম্পতী অথবা কিন্নর মিথুনের মত আকাশের মধ্য দিয়া চলিয়াছি—মাটীতে আর পা পড়িতেছে না।

লাহোর হইতে আমরা অমৃতসরে যাই। সেখানে তিনদিন থাকিয়া কাশ্মীর যাত্রা করি। শ্রীনগরে আমরা প্রায় একমাস থাকি। এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অতিশয় মনোরম তাহা সকলেই জানেন। আমাদের নূতন প্রেমের বন্যা এখানে খুব উছলিয়া উঠিল।

বোম্বাই আসিলাম। আমার ভয় ক্রমশঃ কাটিয়া গেল। প্রথমে যে সকল বিপদের সম্ভাবনা দেখিয়াছিল, এখন তাহা দূর হইল! পুলিশের ভয় নাই। রমেশ-দা খুব চতুর ও হুসিয়ার লোক। যদিও মুকুলদার চিঠিতে জানিয়াছিলাম, বাবা পুলিশে এজেহার দেন নাই, তথাপি তিনি যেখানেই যাইতেন, সেইখানে প্রথম থানার পুলিশ কর্ম্মচারীদের সহিত আলাপ পরিচয় করিতেন। গ্রেপ্তারী পরওয়ানার কোন গন্ধ পাইলে সময় থাকিতে সরিয়া পড়িবেন, এই তাঁহার মতলব ছিল।

স্কুলে, নীচের ক্লাসে পড়িতেই আমি ইংরাজীতে বেশ কথা কহিতে পারিতাম। মুকুলদার শিক্ষায় ও রমেশ-দার সঙ্গে থাকিয়া এই বিষয়ে আমার আরও উন্নতি হইয়াছিল।

হোটেলে আমরা সাহেবী ষ্টাইলে থাকিতাম। আমি পার্শী মেয়েদের ধরণে কাপড় পড়িতাম। সকলের সঙ্গে মেলামেশা করিতে আমার ইংরাজী কথা বিশেষ সহায় হইয়াছিল। বিদেশের

খাওয়া-দাওয়া, চাল-চলন আমি অল্প সময়ের মধ্যেই শিখিয়া লইলাম। প্রথম প্রথম আমি এসব লইয়া অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলাম। রমেশ-দা আমাকে বলেন "হাঁরে মানু, তোরা বাংলা দেশের মেয়ে যদি পঞ্জাবে এসে মনে করিস্, ওরে বাবা—এ কোথায় এলাম—বোম্বাইয়ের লোক যদি বাংলায় স্নেয়ে খাওয়া দাওয়া চলাফেরা নিয়ে মুস্কিলে পরে, মাদ্রাজীরা যদি অযোধ্যাকে ভাবে বিদেশ, তবে বল্ দেখি সমগ্র ভারতে জাতীয়তা গড়ে উঠ্‌বে কি করে ?"

আমি বলিলাম, "ভারতবর্ষ এক বৃহৎ দেশ, এর মধ্যে ভাষার, ধর্ম্মের, সামাজিক রীতিনীতির এত বৈচিত্র, ও বৈষম্য যে এখানে একজাতি গড়ে উঠা অসম্ভব মনে হয়।" রমেশ-দা জোরের সহিত বলেন "এই অসম্ভবকেই সম্ভব কর্‌তে হবে।" রমেশদার এই একটা গুণ দেখিয়াছি, তিনি যেখানেই গিয়াছেন, তাহাকে নিতান্ত পরিচিত স্বদেশ বলিয়া মনে করিতেন—শুধু চিন্তায় নহে, কার্য্যেও।

দিল্লী, লাহোর, শ্রীনগর, বোম্বাই এই সকল সহরে থাকিবার সময় ইতিহাস প্রসিদ্ধ ও তীর্থস্থান সমুহ দর্শন করিয়াছিলাম। ইহাতে আমার মানসিক বিকৃতি কিয়ৎ পরিমাণে দূর হইল। চঞ্চলতার পরিবর্ত্তে হৃদয়ে শান্তভাব আসিল। বিমর্ষতার স্থলে আনন্দের ঔজ্জ্বল্য দেখা দিল ; রমেশদা একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলেন।

শ্রীনগর হইতে বোম্বাই যাইবার পথে আমরা দ্বারকা ও রাজপুতনা হইয়া গিয়াছিলাম। পুষ্কর, ভরতপুর, জয়পুর, চিতোর প্রভৃতি স্থান দর্শন করিয়া আমার প্রাণে এক অপূর্ব্ব প্রশান্ত ভাবের

উদয় হইল। আমি বাড়ীর কথা, বাবার কথা, সমস্ত ভুলিয়া গেলাম। একবার বাবার সঙ্গে এদিকে বেড়াইতে আসিতে চাহিয়াছিলাম। তিনি বিমাতার পক্ষপাতী হইয়া আমাকে লইয়া আসেন নাই। আজ রমেশদার অনুগ্রহে আমার সেই সাধ পূর্ণ হইল। আমি হাঁটিবার সময় রমেশদার হাত ধরিয়া চলিতাম— মোটরে চড়িয়া যাইবার সময় রমেশদার গলা জড়াইয়া বসিতাম। পশ্চিম ভারতের সেই উঁচু নীচু রাস্তায় মোটরে চলিবার সময় স্প্রীংএর মৃদু দোলায় নাচিয়া নাচিয়া আমাদের পরস্পর আনন্দিত বক্ষে কি পুলকের তরঙ্গ উঠিত! রমেশদার প্রতি শুধু প্রেমে নহে—কৃতজ্ঞতায়ও আমার হৃদয় ভরিয়া গেল।

হলদিঘাট দেখাইয়া রমেশ-দা বলিলেন "এই আমাদের ভারতের থার্ম্মোপলি—যেখানে পনর হাজার রাজপুত দেশের জন্য প্রাণ দিয়াছিল। এ বীরত্ব গৌরব আজ আমরা ভুলে গেছি। রমেশদা একটী দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া চুরুটের ধোঁয়া ছাড়িলেন। আমি ডি, এল, রায়ের রাণা-প্রতাপ নাটকের অভিনয় দেখিয়াছিলাম। আমি বলিলাম "এমন কঠোর ব্রত—এমন তীব্র বৈরাগ্য—স্বদেশের দাসত্ব মোচনের জন্য এমন অপূর্ব্ব স্বার্থত্যাগ আর কে করতে পারে? এতবড় উচ্চ আদর্শ আমাদের কল্পনায়ও আসেনা।"

পদ্মিনীর জহর-ব্রতের স্থান দেখিলাম। দর্শনার্থিরা সকলে প্রণাম করিতেছে। তাহাদের দেখাদেখি আমিও মাথা নোয়াইলাম, আমার বুক কাঁপিতেছিল। হাত দুখানি অবশ হইয়া আসিল, আমি পড়িয়া যাইতেছিলাম। পার্শ্বে দণ্ডায়মান রমেশদাকে ধরিয়া বলিলাম, "চল এখান থেকে যাই।"

সেই সতীরাণী স্বর্গ হইতে আমায় কি আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন জানিনা। আজ মনে হয়, যদি ভারতে পদ্মিনীর মত সতীর আদর্শ না থাকিত, তবে মানব সমাজের পথ প্রদর্শক এক উজ্জ্বল ধ্রুবতারা খসিয়া পড়িত। পুরাণে শুনিয়াছি, দক্ষযজ্ঞে এক সতীর অনল প্রবেশ—আর এই দেখিলাম বহু সতীর আত্মত্যাগের মহিমা-ময় তীর্থক্ষেত্র। বুঝিলাম, জহর-ব্রতের তিমির গহ্বরের অগ্নিশিখা পদ্মিনীর দেহ দগ্ধ করে নাই, পাপীর ভোগ লালসাকেই পুড়িয়া ছাই করিয়া দিয়াছে।

একদিন সন্ধ্যায় আমরা বোম্বাই নগরীর অন্তর্গত মালবার শৈল পল্লীতে বায়ু সেবনার্থ ভ্রমণ করিতেছিলাম। ট্যাক্সী বিদায় দিয়া আমরা ধীরে ধীরে পদব্রজে চলিতেছিলাম, সেদিন আমার মন বড় খারাপ ছিল। কেন, তাহা পরে বলিতেছি। দুপুরবেলা আমি ঘুমাইয়া কাটাইয়াছি। রমেশ-দা খবরের কাগজ পড়িতেছিলেন। তাঁহার সঙ্গে বিশেষ কথাবার্ত্তা হয় নাই। আমার বিমর্ষ ভাব লক্ষ্য করিয়া তিনি আমাকে লইয়া বেড়াইতে বাহির হইলেন। চারি-দিকের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখিয়া আমার কিঞ্চিৎ প্রফুল্লতা আসিল। রমেশদা বলিলেন "হাঁরে মানু, তোর এই মলিনমুখ দেখবার জন্যই কি ঘর বাড়ী, পরিবার পরিজন ছেড়ে এসেছি? ব্যাপার কি বল্ দেখি?" এই বলিয়া তিনি আমাকে বাঁ হাতে জড়াইয়া ধরিয়া খুব একবার ঝাঁকিয়া দিলেন। আমি তাঁর বুকে মাথা রাখিয়া মুখ নীচু করিয়া রহিলাম। আমার কান্না পাইল। তিনি আমার চিবুক ধরিয়া আমার দিকে চাহিলেন। অস্পষ্ট আলোকে আমার ছল ছল চক্ষুতে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। তিনি

পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া আমার চক্ষের জলবিন্দু মুছাইয়া দিলেন। এসেন্সের মৃদু সুবাস আমাকে পুলকিত করিয়া চারিধারে ছড়াইল। আমরা নিকটবর্ত্তী একখানা বেঞ্চির উপরে বসিলাম।

তিনি বলিলেন "মানু, তোমার জন্য সমস্ত ছাড়িয়া আসিলাম। নিজের স্ত্রী, বিধবা মা, ছোট ভাইবোন সকলের কথা আজ তোমারই জন্য ভুলেছি। শেষে তুমিও আমায় পরিত্যাগ করবে? তোমায় নিয়ে কি বিপদের সম্মুখে ঝাঁপিয়ে পড়েছি, তা দেখেই বুঝ্‌তে পার তোমায় কত ভালবাসি।" রমেশ-দা আবার আমাকে বুকে চাপিয়া ধরিলেন। আজ আমার এ সকল আদর সোহাগ যেন ভাল লাগিতেছিল না। সম্মুখের অস্পষ্ট অন্ধকারের দিকে আমি স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলাম। আমার হাত দুখানি কোলের উপরে অঞ্জলিবদ্ধ ছিল। রমেশ-দা আমার ডান হাতখানি তুলিয়া তাঁহার নিজের কাঁধের উপর নিয়া রাখিলেন। আমি রমেশ-দাকে অনাদর করিয়াছি ভাবিয়া লজ্জিত হইলাম।

চারিদিক নিস্তব্ধ। পার্শ্ববর্ত্তী প্রশস্ত পথ দিয়া শৈলবিহারী সৌখীন লোকদের দুই একখানি মোটর গাড়ী মাঝে মাঝে মৃদুশব্দে চলিয়া যাইতেছে। রমেশদা বলিলেন 'চুপ করে আছিস্ কেন—কি হয়েছে?" আমি বলিলাম "না কিছু হয়নি। আজ কমলার চিঠি এসেছে, তুমিত দেখেছ"। আমি ডান হাত দিয়া ভাল করিয়া রমেশদার গলা জড়াইয়া ধরিলাম।

একটা সিগারেট ধরাইতে ধরাইতে তিনি বলিলেন "ওঃ—বাড়ীর কথা মনে পড়েছে বুঝি—আরে তুই একেবারেই কচি খুকিটি!" একগাল ধোঁয়া ছাড়িয়া তিনি পুনরায় বলিলেন, "আচ্ছা মানু,

বাড়ীতে তোমার কি আকর্ষণ আছে বল দেখি।—মনে কিছু ক'রোনা; আমি স্বরূপ কথাই বলছি। তোমার মা নাই—ভাই বোন নাই। পিতা দ্বিতীয় পক্ষের ষোড়শী পত্নীকে নিয়ে আমোদ করে বেড়াচ্ছেন—মেয়ের দিকে ফিরেও চান্না, শোবার ঘর থেকে কৌশল করে তোমায় সরিয়েছেন—তোমার মায়ের ছবিখানিকেও দূর করে দিয়েছেন। সেখানে তোমার কি সুখ আছে বল!"

আজ রমেশ-দা অমন কথা বলিলে তার উত্তর আমি অন্যরূপ দিতাম্। কিন্তু তখন আমি ভাবিয়াছিলাম সত্যই "রমেশদা, আমি মরুভূমি থেকে ছুটে এসে শীতল জলধারার সন্ধান পেয়েছি—আমায় ক্ষমা কর। তুমি আমার জন্য কি ছেড়ে এসেছ, তা দেখবার আমার প্রয়োজন নাই, আমার সম্মুখে তুমি যে প্রেমের নৈবেদ্য সাজিয়ে এনেছ, আমি শুধু তাই দেখ্ছি।"

সেখান হইতে একটা টাক্সি ভাড়া করিয়া আমরা সিনেমায় গেলাম। আমার হৃদয়ের প্রফুল্লতা ফিরিয়া আসিল। আমি মনে করিলাম, কেন বৃথা দুশ্চিন্তার ভার বৃদ্ধি করিতেছি। যখন সুধার পাত্র সম্মুখে রহিয়াছে, তখন কোন মূর্খ তাহা গ্রহণ না করিয়া মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যায়?

কমলার যে পত্রের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি তাহাতে সে আমাকে লিখিয়াছিল যে সে আমার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছে। তিনি আমার জন্য খুব মনকষ্ট পাইতেছেন। পুলিশকে তিনি জানাইবেন না—অথবা কোন মামলা মোকদ্দমাও করিবেন না। বিমাতা আমার কথা মনে করিয়া কাঁদেন। হরিমতি তাহার ভবিষ্যৎ বাক্য

সফল হওয়াতে খুব আনন্দিত। সে পাড়ায় পাড়ায় ঘুড়িয়া বলেছে "সে আমি আগেই জানি"। নন্দদাদা স্কুল ছাড়িয়া দিয়াছে। সে নাকি বলিতেছে আমি যেরূপে পারি মানুকে খুঁজে আনব।" মুকুলদার সহিত কমলার বিবাহের প্রস্তাবে কমলার মা সম্মতি দিয়াছেন। রমেশদার বাড়ীর খবর কিছুই পাওয়া যায় নাই।"

এই পত্র পড়িয়া আমার প্রাণে বড় দুঃখ হইয়াছিল। বিমাতা বেচারি বড় ভাল ছিলেন। তিনি আমাকে ভাল বাসিতেন, কিন্তু কখনও তাহা প্রকাশ করিতে পারেন নাই। তিনি চতুরা নারীর মত স্বামীর মন ভুলাইতে কপটতার আশ্রয় নিতেন না। তাঁহার সরল প্রাণ পিতার ইচ্ছা অনুসারে চলিত। তাঁহার জন্য আমার কষ্ট হইল। আর কষ্ট হইল, নন্দদাদার কথা ভাবিয়া, তাহার অসাবধনতার জন্যই আমি পলায়ন করিতে পারিয়াছি। বোধ হয় এজন্য সে হতভাগ্য বাবার কাছে বকুনী খাইয়াছে। তাই বুঝি সে লেখাপড়া ছাড়িয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, আমাকে খুঁজিয়া বাহির করিবে। এক একবার মনে হইত, ধরা দিয়া এমন সাহসী বীরের মর্য্যাদা রাখি।

বোম্বাই হইতে নাগপুর হইয়া আমরা মান্দ্রাজে আসিলাম। সেখানে কিছুদিন থাকিয়া ভিজগাপত্তন ও তৎপরে ওয়ালটেয়ারে উপস্থিত হইলাম। এখানকার সমুদ্র-তীর আমার বিশেষ প্রীতিজনক বোধ হওয়ায় প্রায় দুই মাস তথায় অবস্থান করি। তারপর পুরী হইয়া কাশী যাই। কাশীতে বাঙ্গালীর সংখ্যা নিতান্ত কম নহে। বেড়াইতে বাহির হইলে প্রায়ই বাঙ্গালীর সহিত

সাক্ষাৎ হইত। আমার কেবলি ভয় হয়, কখন্ পরিচিত ব্যক্তির সহিত দেখা হয়—আর ধরা পড়িয়া যাই।

আমি একদিন রমেশদাকে বলিলাম, চল এখান থেকে যাই। চারিদিকে বাঙ্গালী—ফস্ করে কবে চেনা পরিচিত কেউ দেখে ফেল্‌বে, তখনই মুস্কিল"। রমেশদা ইজি চেয়ারে লম্বা হাতলের উপর পা তুলিয়া নিশ্চিন্ত মনে চুরুট টানিতে টানিতে বলিলেন—মেয়েলি বুদ্ধি নিয়ে কি শর্ম্মারাম কাজ করে? জানিস্ এই কাশীতে যত বাঙ্গালী আছে তার অধিকাংশই তোর রমেশ-দার দলের। কেহবা কারো ঘরের বউ বের করে এনেছেন—কেউ বা বিধবা পোয়াতি খালাস কর্‌তে এসেছেন—কেহ আপন রক্ষিতা নারীর হাওয়া বদলাচ্ছেন—আবার এমন কেহ আছেন যাহারা নিজের আত্মীয়া দ্বারা পাপ ব্যবসায় করাচ্ছেন। বাঙ্গালার কলঙ্কের এই তিনটী স্থান—নবদ্বীপ, কাশী ও বৃন্দাবন। ভয় কচ্ছিস্ কাকে? কে কাকে নিন্দা কর্‌বে? এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ। পথের জনসঙ্ঘ কর্ত্তৃক লাঞ্ছিতা এক পতিতা নারী প্রভু যীশুখৃষ্টের আশ্রয় নিয়াছিল। যীশুখ্রীষ্ট সমবেত জন-মণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, তোমাদের মধ্যে যে নিষ্পাপ সে প্রথমে এই নারীর প্রতি লোষ্ট্র নিক্ষেপ কর। তখন কেহই অগ্রসর হইল না। বাইবেলে এই কথা আছে—মনে আছে? আমি বলিলাম "হাঁ, আছে। তুমি যেমন লোক, কাশী বৃন্দাবন নবদ্বীপকে সেই ভাবেই দেখ্‌ছ। পুণ্যের দিক তোমার চোখে পড়্‌বে কেন? তা যাই হউক, তবু চল। এখানে বেশীদিন থেকে কাজ নেই।"

আমরা এলাহাবাদ ও আগরা হইয়া মথুরায় গেলাম। প্রয়াগে গঙ্গাযমুনা সঙ্গমে স্নান করিলাম। তাজমহল, আগরা-ফোর্ট ও সেকেন্দ্রায় আকবরের সমাধি প্রভৃতি দেখিবার জন্য পাঁচদিন আগরায় বিলম্ব হইল। প্রায় পাঁচ মাস ঘুরিয়া আষাঢ় মাসের প্রথম ভাগে আমরা মথুরায় পৌঁছিলাম। এখানে কিছু বেশীদিন থাকিবার ইচ্ছা। এত সহর থাকিতে মথুরার উপর রমেশদার এত মন পড়িল কেন, তাহা তখন বুঝিতে পারি নাই।

স্বামীঘাটের নিকটে একেবারে যমুনার ধারে অল্প ভাড়ায় একটী ভাল বাড়ী পাওয়া গেল।

ক্যাণ্টনমেণ্টের দিকে ইউরোপীয় ধরণের হোটেল একটী আছে বটে, কিন্তু সেখানে থাকা রমেশদার মত হইল না। টাকা ফুরাইয়া আসিয়াছিল, সাহেবী ষ্টাইল আর ত চলেনা। রমেশদা বলিলেন "মথুরায় দেশীয় ভাবে থাকাই সুবিধাজনক।" তিনি কোট প্যাণ্টুলন, টাই টুপি ছাড়িলেন। আমার পোষাকে বিদেশীয় ভাব তেমন কিছুই ছিল না। গোড়ালী উঁচু জুতার বদলে আমি নাগ্‌রাই জুতা পরিলাম। রান্না করিবার জন্য বামুন ঠাকুর রাখা হইল। একটী চাকরও পাওয়া গেল—সে বাজার করিত, জল তুলিত, থালা বাসন মাজিত।

একদিন দেখিলাম রমেশদা গোঁফ কামাইয়া ফেলিয়াছেন। আমি বলিলাম "ওকি রমেশদা, তোমায় ভাল দেখাচ্ছে না।" রমেশদা বলিলেন "ভাবনা কি—আবার গজাবে।"

কথাটা পরিহাসের বাতাসে উড়িয়া গেল। কিন্তু ব্যাপার এইখানে শেষ হইল না—আর একদিন দেখিলাম, রমেশদা

এক নাপিত ডাকাইয়া মস্তক মুণ্ডিত করিলেন, মধ্যস্থলে এক গোছা চুল শিখার মত রাখিলেন। আমার সন্দেহ হইল— ইহার মধ্যে কোন মতলব আছে। তার পর যখন ললাটে, নাসিকায় চন্দনের তিলক ছাপ দিয়া, কাছা শূন্য কাপড় ও মাদ্রাজী জুতা পড়িয়া রমেশদা একেবারে দ্রাবিড়ী পণ্ডিত সাজিলেন, তখন আমার আর বুঝিতে বাকি রহিল না যে রমেশ-দা আত্মগোপনের চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু আমি মুখ ফুটিয়া কিছু বলিলাম না। সমস্ত ঘটনাটী হাসি ঠাট্টার উপর দিয়াই শেষ হইল।

রমেশদা এক সময়ে রেঙ্গুনে থাকিতে মাদ্রাজী কথা শিখিয়াছিলেন। বৃন্দাবনে রঙ্গজীর মন্দিরে যাইয়া তিনি যখন স্বামীজি মহারাজের সঙ্গে আলাপ করিলেন, আমি আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। রামস্বরূপ আয়ার এই নামে রমেশদার চিঠি আসিত। অবশ্য অন্য সহরেও আমরা এযাবৎ ছদ্মনামে বাস করিয়াছি। কিন্তু এবারে রমেশদা যেন একটু বেশী সাবধান হইতেছেন। আমাকে এ সম্বন্ধে তিনি কিছুই বলেন নাই।

কলিকাতায় থাকিতেই রমেশদা বন্ধুদের সহিত মিশিয়া মদ্যপান অভ্যাস করিয়াছিলেন। আমি তাহা জানিতাম না। বাহিরে আসিয়া হোটেলে ইউরোপীয়ান ষ্টাইলে থাকার সময় মদ্যপানের মাত্রা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইল। আমাকেও একটু আধটু খাইতে তিনি অনুরোধ করিয়াছিলেন। আপত্তি করিয়া বলিলাম "না —বিষেশতঃ দেহের এই অবস্থায়।" রমেশদা বলিলেন "সে এখনও ছয়মাস দেরী, তা'বলে কি স্ফূর্ত্তি মাটী করতে হয়?

—আর তোমাদের আঁতুর ঘরে যা খাওয়ান হয়, সে "ভাইনাম গ্যালিসিয়াটা" কি? সেত খাঁটী এক্স নম্বর ওয়ান।" রমেশদার রোজই দু এক গ্লাস চলিত। গন্ধটা আমার সহিয়া গিয়াছিল। কখনও কখনও বোতল হইতে আমিও ঢালিয়া দিতে বাধ্য হইতাম।

ইউরোপে তখন মহাযুদ্ধ। মথুরার ক্যাণ্টনমেণ্টে অনেক গোরা পল্টন আসিয়াছে। চারিদিক হইতে সৈন্য সংগ্রহ ও রসদ জোগাইবার ব্যবস্থা। রমেশদা বলিলেন "মানু, আমি একটু ক্যাণ্টনমেণ্টের দিকে যাচ্ছি, দেখি—যদি ভাল এক বোতল জোগাড় কর্‌তে পারি। এই সহরে কিছু পাওয়ার যো নাই। এরা কেবল সিদ্ধি ভাং নিয়েই ব্যস্ত।" রমেশদা বাহির হইয়া গেলেন। আমি বাড়ীতে একাকী।

চাকর একখানি ডাকের চিঠি দিয়া গেল। খুলিয়া দেখিলাম কমলা লিখিয়াছে। চিঠিখানা পড়িয়া আমি বজ্রাহত হইলাম। রমেশদা যে আফিসে চাকুরী করিত, তাহার তহবিল হইতে তিন হাজার টাকা চুরি করিয়াছে। চারি মাসের ছুটী লওয়ার কথা মিথ্যা। রমেশদার বিরুদ্ধে সেই কোম্পানী পুলিশের নিকট অভিযোগ করিয়াছে। গ্রেপ্তারী পরওয়ানা বাহির হইয়াছে। আমাকে অপহরণ করার অভিযোগ আমার পিতা না করিলেও আমার মামা (নন্দদাদার পিতা) পুলিশকে জানাইয়াছেন। এই উপলক্ষে পুলিশ আমাদের বাড়ী, মুকুলদার বাসা, কমলাদের বাড়ী, রমেশদার বোর্ডিং এবং রমেশদার বাড়ী অনুসন্ধান করিয়াছে। কমলার এবং মুকুলদার নিকট হইতে

পুলিশ রমেশদার বোম্বাই ও কাশীর ঠিকানা পাইয়াছে। গোয়েন্দা পুলিশ রমেশদার পিছু লইয়াছে।

আমার শরীর ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। তারপর রমেশদার উপর আমার অমানুষিক ক্রোধ ও ঘৃণার উদয় হইল। আমি কিছু বুঝিনা বলিয়া আমার সহিত এত প্রতারণা—আমি প্রাণ দিয়া ভাল বাসিয়াছি, বিশ্বাস করিয়াছি, তার প্রতিদান বুঝি এই জঘন্য ব্যবহার। আমি স্তব্ধ হইয়া রহিলাম।

সন্ধ্যার পরে রমেশ-দা আসিলেন। অতিরিক্ত মদ্যপানে তিনি মত্ত হইয়াছেন—চোখ দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম। আমি কঠোর স্বরে কহিলাম "রমেশদা, তুমি যে চা'রমাসের ছুটী নিয়েছিলে, তার উপর আরও একমাস হ'য়ে গেল, অথচ"—আমার কথা শেষ না হইতেই রমেশ-দা জড়িত কণ্ঠে কহিল "সে কৈফিয়ৎ কি তোর কাছে দিতে হবে নাকি?—তুই কি আমার মনিব?" আমি বলিলাম, কৈফিয়ৎ চাহিনা, কারণ-ত আমায় বল্‌তে পার!

রমেশ।—আমি আরও তিন মাসের ছুটীর দরখাস্ত করেছি। এইবার সন্দেহ মিটেছে?

আমি।—সন্দেহ নয় রমেশদা, তুমি জান, হাতের টাকা সব ফুরিয়ে গেছে। আর এক সপ্তাহও চল্‌বে না। যদি তুমি এখন কল্‌কাতায় ফিরে না যাও, তবে অন্ততঃ ছুটীর মাসের বেতনটাও আনাতে পার। সেওত আটশত টাকা হবে।

রমেশ।—সে ভাবনা তোমায় কর্‌তে হবে না। সিগারেটের প্যাকেট আর দেশালাইটা দাও ত।

আমি হুকুম তামিল করিয়া বলিলাম "রমেশদা, দেখ্ছ ত আমার দেহের গতিক। এমন অবস্থায় কোন ভাল সহরে—যেখানে ভাল ডাক্তার অথবা প্রসূতি হাসপাতাল আছে—এমন স্থানে না থাকিলে আমার ভয় হয়। তাতেও অনেক টাকা খরচ হবে।

রমেশদা টলিতে টলিতে খাটীয়ার উপর শুইয়া পড়িলেন। সিগারেট টানিতে টানিতে বলিলেন "টাকার আর ভাবনা কি মানু। দেখছিস্ ত এক থোকে আড়াই হাজার টাকা।" রমেশদা কাশিতে কাশিতে 'ওয়াক্ ওয়াক্' করিতে লাগিলেন। আমি একটা বাটী সম্মুখে রাখিয়া বলিলাম, "আড়াই হাজার কেন, তিন হাজার বল।" রমেশদা চক্ষু বিস্ফারিত করিলেন। তাঁহার বমির ভাব চলিয়া গেল।

আমি বলিলাম "রমেশদা, তুমি তিন হাজার যে ভাবে পেয়েছ তা আমি জানি। সেই রকম রোজগারের আর এক কানাকড়িও আমি চাহি না। যদি ক্ষমতা থাকে, সৎপথে থেকে উপার্জ্জন করে আমায় রাখ—চুরি জোচ্চুরির পথে গিয়ে নিজে মজোনা—আমায়ও মজিও না।"

রমেশদা নেশার ঘোরে বলিতে লাগিলেন "মানু, তোকে নিয়ে আমি সর্ব্বত্যাগী হলুম, আর তুই আমায় চোর বল্‌ছিস? আমি কার জন্যে চুরি করেছি?—কার জন্য স্ত্রীকে ছেড়েছি, মাকে ছেড়েছি?—কার জন্য জেলে পা বাড়িয়েছি? যাঃ—চ্চলে, এই দুনিয়ায় দরদী কেউ নেই—প্রেমের মর্য্যাদা কেউ বুঝলে না। ওরে, চোর না হলে কেউ প্রেমিক হয় না। এই মথুরা তার

সাক্ষ্য দিবে। বেশ, তুমি তবে সাধুসজ্জন নিয়ে থাক—আমি এই মূহুর্ত্তে চল্লুম।

রমেশদা উঠিয়া টলিতে টলিতে জুতা পরিলেন, জামা গায়ে দিলেন। একি, সত্যই তিনি চলিলেন। অমি ছুটিয়া যাইয়া তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিলাম, "রমেশদা আমায় ছেড়ে যেওনা, আমার অপরাধ হয়েছে, ক্ষমা কর—আমায় অকূল সমুদ্রে ভাসিও না।"

রমেশদা এক লাথি মারিয়া আমাকে দূরে ফেলিয়া ক্রোধোন্মত্ত স্বরে চীৎকার করিয়া কহিলেন, "চুপ রও সয়তানী, —আমি তোমার কোন কথা শুনতে চাই না। তোমার ধর্ম্মজ্ঞান নিয়ে তুমি থাক।" নেশার ঘোরে তিনিও পড়িয়া যইতেছিলেন। আমি তাড়াতাড়ি তাঁহাকে বিছানায় শোয়াইয়া মাথায় জল দিয়া বাতাস করিতে লাগিলাম।

কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁর খুব বমি হইতে লাগিল। বিছানা মেজে সব ভাসিয়া গেল। দুর্গন্ধে ঘর ভরিয়া উঠিল। বামুন ঠাকুর অথবা চাকর হইারা কেহ কাছে আসিল না। আমি নিজেই বাল্‌তি করিয়া জল আনিয়া সমস্ত পরিষ্কার করিলাম। সে রাত্রিতে আমাদের কাহারও আহার হইল না। আমি তাঁহাকে বাতাস করিতে লাগিলাম। শেষ রাত্রিতে তাঁর খুব ঘাম হইয়া দেহ একেবারে হিম হইয়া গেল। আমার বড় ভয় হইল। মানসিক উদ্বেগে দুশ্চিন্তায় সারা রাত্রি আমার ঘুম হইল না।

পরদিন বেলা নয়টার সময় রমেশদার চৈতন্য হইল। তাঁহাকে স্নান করাইয়া একট গরম দুধ দিয়া কোকো তৈয়ারী করিয়া

খাইতে দিলাম। কমলার চিঠিখানি তিনি আদ্যন্ত পড়িলেন। বুঝিলেন ব্যাপার গুরুতর হইয়া উঠিয়াছে।

আমাদের প্রণয়ের নির্ম্মল আকাশে মেঘের সঞ্চার হইল। বিশ্বাসের স্থলে সন্দেহ আসিল। রমেশদাকে এক নূতন চক্ষে আমি দেখিতে লাগিলাম। তাঁহার চরিত্রের নানাদিক আমার সম্মুখে পরিস্ফুট হইয়া উঠিল—লম্পট, চোর, বিশ্বাসঘাতক, মিথ্যাবাদী, মাতাল!

পঞ্চম

পাপের পথে

তারপর হইতে নানা খুটিনাটি লইয়া রমেশদার সহিত আমার প্রায়ই ঝগড়া হইতে লাগিল। হাতে নগদ টাকা যাহা ছিল, সমস্ত খরচ হইয়া গিয়াছে, মুকুলদার কাছে চিঠি দেওয়ায় তিনি পঞ্চাশ টাকা পাঠাইয়াছিলেন—তাহাও অতি কষ্টে। তিনি অল্প বেতনে সামান্য মাষ্টারী করেন। সেই পঞ্চাশ টাকার মধ্যে আটাশ টাকা রমেশদা মদ খাইয়া উড়াইয়াছেন। দুর্ভাগ্য যখন আসে তখন এমনই হয়। বেতন না পাইয়া বামুন ঠাকুরটি চলিয়া গিয়াছে। দুই বেলা আমিই রান্না করি। আমি রন্ধন কার্য্য জানিতাম না—কখনও শিখি নাই। অসুস্থ দেহ লইয়া আগুনের তাপে ও ধোঁয়ায় আমার প্রাণ যায় যায় হইয়া উঠিত।

মথুরায় একটা কাজকর্ম্মের চেষ্টা দেখিতে বলিলাম। কিন্তু সে কথা রমেশদা গ্রাহ্য করিলেন না। শীতের জন্য এক সুট্

দামী পোষাক ছিল, তাহা বিক্রয় করিয়া কিছু টাকা সংগ্রহ হইল। ক্রমে ক্রমে আমার গহনাগুলিও বিক্রয় করিলেন। আমার বিমাতা জন্মদিনের উপহার স্বরূপ আমাকে যে একছড়া সোনার হার দিয়াছিলেন, তাহা আমি বিক্রয় করিতে দিব না বলিয়া লুকাইয়া রখিয়াছিলাম। এই অপরাধে আমার উপর খুব মার-ধর ও বকুনি হইল। আজকাল কথায় কথায় লাথি, চড়-চাপড় এসব আমার ভাগ্যে জুটিত। আমি কেবল কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহা সহ্য করিতাম।

রমেশদা আমাকে একদিন বলিলেন, "কমলাকে কিছু পাঠাইতে চিঠি লেখ।" আমি বলিলাম, কমলা দরিদ্র ঘরের মেয়ে, সে টাকা পাইবে কোথায়?" ইহা লইয়া রমেশদা আমার উপর খুব রাগ করিলেন। আমি অগত্যা কমলাকে চিঠি লিখিলাম। সে কুড়িটাকা পাঠাইল। তাহাও কয়েকদিনেই ফুরাইয়া গেল!

আমার দুই একখানা দামী কাপড় ও গহনা তখনও ছিল। রমেশদা নানা কৌশলে তাহা আমার নিকট হইতে নিয়া বিক্রয় করেন। কেবল সেই সোণার হারছড়া তখনও আমি দেই নাই। একদিন তিনি আসিয়া বলিলেন "মানু, বৃন্দাবনে প্রেম-মহা-বিদ্যালয়ে একটা প্রফেসারী কাজ পেয়েছি। রাজা মহেন্দ্র প্রতাপের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে। লোকটা ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের ভয়ানক বিরোধী। আমারও সেইভাব, তুমিত জানই। রাজা খুব খুসী হলেন। আমাকে এখন মাসিক একশত টাকা বেতন দিবেন।" আমি শুনিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলাম।

রমেশদা চিন্তাকুল চিত্তে কহিলেন "একসুট পোষাক

তৈয়ারী করা দরকার—কিন্তু টাকারই ত অভাব।” আমি বলিলাম, “আমার সোণার হারছড়া বাঁধা রেখে কিছু টাকা ধার কর, তারপর একমাসের বেতন পেলেই ছাড়িয়ে আনতে পারবে।” রমেশদা মুখ ফিরাইয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন “না, তাও কি হয়, তোমার সৎমার স্নেহের উপহার।” আমি বুঝিলাম, সেদিনের ব্যাপারে আমার উপর এ অভিমান ও শ্লেষ। আমি তখনি আমার হাতবাক্স খুলিয়া রমেশদার কোলের উপর হারটা ফেলিয়া দিলাম। সেই হার বন্ধকে পাওয়া দেড়শত টাকা রমেশদার হাতেই খরচ হইয়াছে। অথচ প্রফেসারী চাকুরীর জন্য যে একস্যুট পোযাক তৈয়ারী করিবার কথা ছিল তাহা হয় নাই।

আমার সন্দেহ হইল, চাকুরীর কথা মিথ্যা। আমার শেষ সম্বল হার-ছড়া হস্তগত করিয়া তাহা দ্বারা মদের মূল্য সংগ্রহ করাই রমেশদার উদ্দেশ্য ছিল। আমি একদিন জিজ্ঞাসা করিলাম “কবে থেকে প্রফেসারী আরম্ভ করবে? রমেশদা বেশ চতুরতার সহিত উত্তর করিলেন “রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ হঠাৎ বৃন্দাবন ছেড়ে চলে গেছেন। গভর্ণমেণ্ট তাঁর গ্রেপ্তারী পরওয়ানা বাহির করেছে। এইত হয়েছে এখন মুস্কিল।” পাছে আমার সন্দেহ হয়, সেইজন্য ‘হিন্দু নামক সংবাদপত্র হইতে পড়িয়া আমাকে রাজা মহেন্দ্র-প্রতাপের বিষয় শুনাইলেন।

মথুরায়, বৃন্দাবনে তখন ঝুলনের উৎসব আরম্ভ হইয়াছে। আমি রমেশদাকে বলিলাম “চল একবার দ্বারকাধীশের মন্দিরে যাই।” তিনি বলিলেন “না, আমার শরীরটা ভাল লাগছে না। তুমি লছমনকে সঙ্গে নিয়ে যাও।” লছমন আমাদের চাকরের

নাম। আমি বাহির হইয়া গেলাম। রমেশদা বাড়ীতে রহিলেন।

ঝুলনের সময় মথুরার মন্দিরে মন্দিরে খুব আমোদ প্রমোদ হয়। দ্বারকাধীশের মন্দিরেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। স্বর্ণ-রৌপ্য-মণ্ডিত বৃহৎ সিংহাসনে ঠাকুরকে বসাইয়া দোলান হয়। সমস্ত মন্দির আলোক, পুষ্পপত্র, পতাকায় সুসজ্জিত হইয়া এক অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করে। গায়কগণ সুললিত স্বরে ভজন গানে রত থাকেন। এই সকল দর্শন করিলে নানা দুঃখ ও বিপদের মধ্যেও শান্তির ভাব আসে।

আমরা বিশ্রাম ঘাটের আরতি এবং আরও দুই তিনটী মন্দিরে ঝুলন দেখিয়া রাত্রি প্রায় ৯টার সময় বাড়ীতে ফিরিলাম। ঘরে যাইয়া দেখি রমেশদা নাই। আলো জ্বলিতেছে। শোবার খাটিয়ার উপরে একখানি চিঠি রহিয়াছে। পড়িয়া দেখিলাম তাহাতে এরূপ ভাবের লেখা ছিল—

"মানু, তোমার সঙ্গে আর থাকা যায় না। তুমি আমায় চোর, লম্পট, মাতাল বলে ঘৃণা করতে আরম্ভ করেছ। যেখানে ঘৃণা ও সন্দেহ, সেখানে ভালবাসার স্থান নাই। আজ আমি তিন হাজার টাকা আফিসের ক্যাশে গুঁজে দিলেই আমার চোর অপবাদ ঘুচবে—আরও দু'চার দশটা মেয়ে বের করলেও, আমি সমাজে বুক ফুলিয়ে বেড়াব—আর মদ্যপান, সেত বড়লোকের লক্ষণ। তুমি নিজের ভাল বুঝলে না। তোমার আর উদ্ধার নাই। দেখব তোমার নব জাগ্রত নীতিজ্ঞান তোমাকে কতদূর রক্ষা করে। আমি চল্লাম—আমায় খুঁজোনা। পুলিশ আমার পিছু নিয়েছে। তুমি অবিলম্বে এই বাড়ী ছেড়ে যেও।"

আমার হঠাৎ মনে হইল, একটা পর্ব্বত-প্রমাণ বোঝা যেন

আমার মাথার উপর হইতে সরিয়া গেল। ডুবিতে ডুবিতে আমি যেন জলের উপরে নাক্ তুলিয়া একটু নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলাম। রমেশদার ব্যবহার আমার এত অসহ্য হইয়াছিল। আমি স্বাধীনতা চাহিয়াছিলাম, ভগবান বুঝি তাহারই পথ খুলিয়া দিলেন।

রাত্রিতে রান্না খাওয়া হইল না। গভীর রাত্রিতে আমার মনে নানা দুশ্চিন্তা আসিল। এখন কি করি, কোথায় যাই। ভাবিলাম, দুর্ব্বল চিত্ত হইলে চলিবেনা। অনিদ্রায় রাত্রি কাটিল। সকালে উঠিয়া চারিদিকে চাইতেই রমেশদার জন্য দুঃখ হইল। চা তৈয়ারী করিলাম না। লছমনকে ডাকিয়া বলিলাম "আমি বৃন্দাবনে যাব, একখানি এক্কা অথবা টাঙ্গা ঠিক করে দাও।"

আমার গহনার মধ্যে হাতে দুগাছা সোনার চুড়ী ও কাণে একজোড়া দুল মাত্র অবশিষ্ট ছিল। সে সমস্ত বিক্রয় করিয়া চাকরের তিনমাসের বেতন চুকাইয়া দিলাম। আমার হাতে কিছু টাকাও রহিল। সেই সময়ে কমলার একখানি চিঠি পাইলাম। সে লিখিয়াছে, "রমেশবাবুর সঙ্গে পলায়ন করা তোমার ভুল হইয়াছে। এ প্রকার প্রেমের মিলন যেমন হঠাৎ এসে পড়ে, বিচ্ছেদও তেমনি হঠাৎ হয়ে যায়। তোমাদের উভয়ের বিবাহে এমন বিশেষ কিছু বাধা ছিল না। তোমার পিতারও বোধ হয় অমত হ'ত না। এখনও তুমি ফিরে এসে ভ্রম সংশোধন করতে পার।"

কমলার উপদেশ আমার ভাল লাগিল না। তাহার পত্রের কোন উত্তর দিলাম না। বৃন্দাবনে যাইয়া সেবা-কুঞ্জের নিকটে

একখানি ছোট ঘর ভাড়া লইলাম। তাহার আশে পাশে আরও অনেক বাঙ্গালী স্ত্রীলোক বাস করিত, তাহাদের প্রায় সকলেই অধিক বয়সের বিধবা। আমি তাহাদিগকে বলিলাম, "মথুরায় থাকিতে আমার স্বামী ও শ্বাশুড়ীর কলেরায় মৃত্যু হইয়াছে। দেশে আত্মীয় স্বজনের নিকট চিঠি লিখিয়াছি।" সকলেই আমার জন্য দুঃখপ্রকাশ করিল।

একমাস পরে আমি এই ঘর ছাড়িয়া কেশীঘাটের নিকট যাইয়া বাস করিতে লাগিলাম। হাতের সামান্য টাকা ফুরাইয়া আসিয়াছিল। ইতিমধ্যে একবার জ্বর হইয়া প্রায় দশদিন ভুগিয়াছিলাম। ভিক্ষা করিতে পারিলে আহারের অভাব হয় না, কিন্তু আমার শরীর এত দুর্ব্বল হইয়াছিল যে চলিতে পারিতাম না।

দুইদিন কিছু খাই নাই। ভিক্ষা চাহিতে জানি না। বংশীবটের নিকট রাস্তার ধারে শুইয়া আছি। ভাবিতেছি, এখন মরণ আসিলেই বাঁচি। একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক যাইতেছিলেন, তিনি আমার দুরবস্থা দেখিয়া দয়ার্দ্র হৃদয়ে আমাকে সঙ্গে লইয়া গেলেন। ইনি এক সাধু মোহান্তের শিষ্য। মোহান্তজীর বৃহৎ আশ্রম—তাহাতে দেব-বিগ্রহ ও বহু শিষ্য-সেবকাদি রহিয়াছে। মোহান্তজী বাঙ্গালী। তাঁহার বয়স প্রায় ৬৫, মস্তকে জটা, আবক্ষলম্বিত দীর্ঘ শশ্রু—অঙ্গে চন্দন বিভূতি। তিনি আসনে বসিয়াছিলেন। আমাকে দেখিয়া শিষ্যকে বলিলেন "একে নিয়ে এসেছ কেন? এ যে অন্তঃস্বত্ত্বা। কোন দুষ্ট লোকের প্ররোচনায় পালিয়ে এসেছে, এখন সেই লোকটী সরে পড়েছে। এর অনেক কষ্টভোগ আছে। আচ্ছা, কিঞ্চিৎ ঠাকুরের প্রসাদ একে দাও।"

আমি একটু সুস্থ হইলে তিনি আমাকে বলিলেন "মা, আমার এই আশ্রমে ত স্ত্রীলোক রাখ্‌বার নিয়ম নাই। বিশেষতঃ তুমি গর্ভবতী—সম্মুখে অনেক বিপদ। তুমি এখন কি কর্‌বে বল।" আমি কাঁদিয়া তাঁহার পা জড়াইয়া বলিলাম, "বাবা আমি মহা-পাপী, আমায় উদ্ধার করুন। আপনি ত মনের কথা সবই জানেন।" মোহান্তজী বলিলেন "হাঁ, আমি সব জানি। তোমার মনের কথা তুমি যাহা না জান আমি তাহাও জানি। এই অনুতাপ ক্ষণস্থায়ী ও অপ্রকৃত। কামপ্রবৃত্তি একবার হৃদয়ের মধ্যে শিকড় গজাইয়া উঠিলে আর রক্ষা নাই। দুঃখ-দারিদ্র্য, রোগশোকে, সাময়িক বিচার-বুদ্ধিতে সেই পাপ বৃক্ষকে মাঝে মাঝে ছেদন করিয়া দেয়; কিন্তু আবার অনুকূল অবস্থায় নূতন অঙ্কুর জন্মে। একমাত্র ঈশ্বরের কৃপা ব্যতীত এই প্রলোভনকে স্থায়ীরূপে জয় করা যায় না। ইহার জন্য কঠোর সাধনার প্রয়োজন।"

আমি অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলাম "আমায় ক্ষমা করুন, আমায় আশ্রয় দিন।" মোহান্তজী স্নেহপূর্ণ স্বরে কহিলেন "মা, অন্নবস্ত্র দেওয়ার দয়া তুমি অনেক পা'বে। সেই দয়ার অভাব সংসারে নাই। তোমাকে এখন যে আক্রমণ করেছে সে দারিদ্র্য নহে—সে তোমার দুর্দ্দমনীয় প্রবৃত্তি। সেই আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার আশ্রয় ত তুমি চাওনা, তোমার প্রার্থনা অন্নবস্ত্র ও বাসগৃহ। আচ্ছা, তুমি ঘরে ফিরে যাবে?"

আমি সম্মতি জানাইলে তিনি আমার পিতার নাম ঠিকানা লিখিয়া লইলেন। পরে শিষ্যকে ডাকিয়া বলিলেন "কলিকাতায় চিঠি লেখ। আশ্রমের পাশের বাগানে রামকিষণ তাহার স্ত্রী ও

ছোট দুইটী ছেলে নিয়ে আছে। তাদের সঙ্গে এ স্ত্রীলোকটীও থাক্‌বে। সব ঠিক করে দাও।” শিষ্য চলিয়া গেলে তিনি আমাকে বলিলেন, “তোমার পিতা তোমায় পুনরায় গ্রহণ কর্‌বেন ব'লে, আমার মনে হয়না। তাঁকে ত সমাজ মেনে চল্‌তে হচ্ছে। পাপ—প্রলোভনের বশীভূত হওয়া একটা আধ্যাত্মিক ব্যাধি। প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা শুদ্ধ না হ'লে চিত্ত কিছুতেই ঈশ্বরাভিমুখী হ'তে পারেনা।”

রামকিষণের পরিবারের সহিত আমি আশ্রমের বাগানে বাস করিতেছি। রামকিষণ বাগানের তত্ত্বাবধান করে। প্রত্যহ গোয়ালঘর পরিষ্কার করা, তিনটী গাভী ও কয়েকটী বাছুরকে খৈল, ভূষি, খাওয়ান, দশ বার কলসী জল ইন্দারা হইতে তুলিয়া বাগানে দেওয়া, ঠাকুরের ভোগ রান্না করিবার পাত্রাদি মাজা, সাধুদের ভোজন হইয়া গেলে সেই স্থান পরিষ্কার করা, আমার নিজের আহারের জন্য গম পিষিয়া লওয়া আমার নিত্য কর্ত্তব্যরূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। আমি সন্তুষ্টচিত্তে এই সকল কার্য্য করিতাম। কিন্তু আমার বড় পরিশ্রম বোধ হইত। মোহান্তজীর নির্দ্দেশ অনুসারে আমার মাথার চুল ছোট করিয়া কাটিয়া ফেলা হইয়াছিল। কেবলমাত্র প্রভাতে মঙ্গল আরতির সময় আমি মন্দির প্রাঙ্গণে যাইবার অনুমতি পাইয়াছিলাম। মোহান্তজী বাগানে আসিলে প্রয়োজন মত আমার সহিত কথাবার্ত্তা বলিতেন।

একমাস পরে আমার পিতার চিঠি আসিল। তিনি মোহান্ত-জীকে জানাইয়াছেন যে তিনি আমাকে গ্রহণ করিতে পারেন না। এমন কন্যাকে তিনি মৃতার ন্যায় জ্ঞান করেন। তখন তর্ক

করিবার বুদ্ধি আমার ছিল না। আমার শরীর ও মন দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু আজ আমি পিতার কথার উত্তর দিতে পারি। আমার এই আত্মচরিত লেখা আরম্ভ করিবার কিছুদিন পূর্ব্বে গত ঝুলনের সময় আমি বৃন্দাবনে গিয়াছিলাম। সেখানে মোহান্তজীর সঙ্গে আমি পুনরায় সাক্ষাৎ করি। তাহার বিবরণ যথাস্থানে লিখিব। তখন তাঁহাকে বলিয়াছিলাম "বাবাজী, আমি মহাপাপী, সমাজে আমার স্থান নাই—পিতা আমায় পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু আমার মত পাপরতা, পতিতা নারীর পদতলে যে সকল পুরুষ তাহাদের মান, মর্য্যাদা, অর্থসম্পত্তি, দেহমন বিক্রয় করেছে, ঐ দেখুন, তাদেরে সমাজ মাথায় তুলে রেখেছে—তারা কবি ও সাহিত্যিক বলিয়া প্রশংসিত, রাজনীতিক ও দেশসেবক বলিয়া বিখ্যাত—ধনী ও প্রতিপত্তি-শালী, বলিয়া সম্মানিত। এমন কি অনেক ঋষি-মোহান্তও গুরুগিরি ফলাইয়া সমাজের শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত আছেন, তাহা সমাজ জানিয়া শুনিয়াও নীরব। কোর্টে, কাউন্সিলে, করপোরেশনে, গুরুগিরিতে কোথাও তাদের কোন বাধা নাই। আর আমরা কবে বালিকা-বয়সের নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য এক ভুল করে ছিলাম, তার ফলে এই বার-বৎসর ধরে, জ্বলে পুড়ে মরছি। এই ত আপনাদের সমাজের বিচার!"

তিনমাস অতীত হইয়া গেল। একদিন মোহান্তজী বাগানে ব... লে রামকিষণ তাঁহাকে বলিল, "বাবা, এ যে পোয়াতী মেয়ে, এত খাটুনীতে পেটের ছেলেটার কোন কিছু না হয়।" আমি তখন নিকটেই বসিয়া গোবরের ঘুঁটে তৈয়ার করিতে

ছিলাম। মোহান্তজী বলিলেন "পেটের ছেলে কি আর বেঁচে আছে! এখন কোনরূপে প্রসব হয়ে গেলে ভাল। এইটুকু পরিশ্রম না কর্‌লে শরীর খারাপ হয়ে যাবে যে।" রামকিষণ আশ্চর্য্য হইল। মোহান্তজী বলিলেন "মেয়েটার দেহে কুৎসিত ব্যাধি প্রবেশ করেছে। প্রবৃত্তির উত্তেজনায় মানুষ স্বাস্থ্যবিধিও ভুলে যায়।"

যথা সময়ে আমি একটী মৃত পুত্র প্রসব করিলাম। রাম-কিষণের স্ত্রী আমার সেবাশুশ্রূষায় রত হইল। এই সরল প্রকৃতি অশিক্ষিতা কৃষকরমণীর মাতৃসম স্নেহের কথা আমার চিরদিন মনে থাকিবে। কিছুদিন পূর্ব্বে যখন পুনরায় বৃন্দাবনে গিয়াছিলাম, তখন রামকিষণের স্ত্রীর খোঁজ করিয়াছিলাম। কিন্তু শুনিলাম আমি যাইবার আটমাস পূর্ব্বে তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

সন্তানপ্রসবের পর আমার নানা রোগ দেখা দিল। কিছু খাইতে পারিতাম না। সন্ধ্যার সময় অল্প জ্বর হইত। সঙ্গে সঙ্গে পেটের অসুখ। আমি একেবারেই শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলাম। মোহান্তজী যথাসম্ভব আমার চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। প্রায় চারিমাস ভুগিয়া আমি কিঞ্চিৎ সুস্থ হই। এই সময়ে একদিন রাত্রিশেষে আমি বিছানায় পড়িয়া মাথার যন্ত্রনায় ছট-ফট করিতেছিলাম। আমার মনে হইল আমি যেন আমাদের কলিকাতার বাড়ীতে আছি। মা আমার কাছে বসিয়া আমার মাথায় হাত বুলাইতেছেন। আমি ঘুমের ঘোরে বলিলাম "মা তোমরা যে থিয়েটারে যাবে, আমায় সঙ্গে নিয়ে চল।" মা বলিলেন "না,—তুই এখন ছেলে মানুষ।" তারপর কে

আসিয়া, মাকে ডাকিল। মা উঠিয়া গেলেন। আমি চীৎকার করিয়া বলিলাম "মাগো—আমায় নিয়ে যাও,"—রামকিষণের স্ত্রী পাশের ঘর হইতে ছুটিয়া আসিল। আমি তখনও কাঁদিয়া বলিতেছি "মাগো, আমায় নিয়ে যাও গো।" এই স্বপ্নের কথা আমি মোহান্তজীকে বলিয়াছিলাম। তিনি শুনিয়া বলিলেন, "তোমাকে আরও অনেক ভুগ্‌তে হবে।" আমি দীক্ষা গ্রহণ করিতে চাহিলাম। তিনি বলিলেন "মা, আমি দৈবকে অতিক্রম কর্‌তে পারিনা। দীক্ষা নেবার তোমার এখনও সময় হয় নাই।"

আরও ছয় সাত মাস গেল। আমার আশ্রম বাস প্রায় এক বৎসর হইল। শরীর একটু ভাল হইয়াছে, এখন শ্রমের কার্য্যও নিয়মমত করিতে পারি। মোহান্তজীর শিষ্যদের মধ্যে কেহ কেহ নির্দ্দিষ্ট সময়ে বাগানে যাইয়া ঠাকুরের ভোগের জন্য তরীতরকারী ফলমূল শাকসব্জী লইয়া আসিতেন। ইহাদের একজনের সহিত কোন কথা প্রসঙ্গে আমার কুদৃষ্টি দূর হইতে মোহান্তজী লক্ষ্য করেন। আমি যদিও তাঁহার প্রতি কুভাবে আসক্ত হইয়াছিলাম কিন্তু তিনি ছিলেন নির্ম্মল চরিত্র। তবুও তদবধি তাঁহাকে আর বাগানে পাঠান হইত না।

আমি এক দীর্ঘ প্রেমপত্র লিখিয়া তাঁহাকে দিবার জন্য এক দিন বেলা প্রায় দুইটার সময় আশ্রমে প্রবেশ করি। জানিতাম, তখন মোহান্তজী তাঁহার আসনে ধ্যানস্থ থাকেন। আশ্রমপ্রাঙ্গণে একটী বৃহৎ বৃক্ষের তলায় আমি দাঁড়াইয়াছিলাম। হঠাৎ দেখিলাম, মোহান্তজী আমার দিকে আসিতেছেন। আমি ভীত হইলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "এ সময়ে তুমি আশ্রমে

এসেছ কেন ? এখন তোমার আসিবার কথা নয় !” আমি কিছু মাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া তখনই উত্তর দিলাম, “শ্যামলী গাইয়ের বাছুরটা এইদিকে ছুটে এসেছে।” মোহান্তজী গম্ভীর স্বরে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন “বাহিরে যাও—বাছুর এখানে আসেনি। এলেও সে রামকিষণের কাজ—তোমার নয়—”।

পরদিনই মোহান্তজী আমাকে ডাকিলেন। আমি সভয়ে তাঁহার সম্মুখীন হইলাম। তাঁহার নিকটে আর একজন প্রৌঢ় বাঙ্গালী ভদ্রলোক বসিয়াছিলেন। মোহান্তজী আমাকে বলিলেন “তোমাকে আজই এই ভদ্রলোকটীর সঙ্গে কলিকাতায় যেতে হবে। সেখানে ইনি তোমার সকল ব্যবস্থা করে দিবেন।” আমি মনে মনে সুখী হইলাম।

মোহান্তজী সাংসারিক জীবনে একজন উচ্চ পদস্থ ব্যক্তি ছিলেন। সেই সূত্রে তাঁহার অনেক বন্ধু বৃন্দাবনে যাইয়া তাঁহার সহিত দেখা সাক্ষাৎ ও ধর্ম্মালোচনা করিতেন। যে ভদ্র লোকটীর সঙ্গে আমি কলিকাতায় আসিলাম, তিনি মোহান্তজীর বন্ধু। তাঁহার গৃহে আমি প্রায় দশ দিন অবস্থান করি।

কলিকাতা নগরের উপকণ্ঠে কোন স্থানে শ্রীযুক্ত—দাস একটী নারী—উদ্ধার-আশ্রম স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি একজন আইন ব্যবসায়ী। দেশকর্ম্মী বলিয়াও প্রসিদ্ধ। মোহান্তজীর বন্ধু সেই প্রৌঢ় ভদ্রলোকটী আমাকে নারী-উদ্ধার-আশ্রমে রাখিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত দাসের সহিত ইঁহার বিশেষ পরিচয় ছিল।

আমার জীবনের ইতিহাসের এক অধ্যায় শেষ হইল। পিতার অনাদর, কুশিক্ষা ও কুসংসর্গ আমাকে পাপের পথে আনিয়াছে।

আমি কখনও সংযম শিখি নাই। প্রবৃত্তির অনলে কেবল ইন্ধন যোগাইয়াছি। গল্প, উপন্যাস পাঠ করিবার ফলে সমাজ শৃঙ্খলার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ভাবই কেবল আমার মনের মধ্যে বদ্ধমূল হইয়াছে। উত্তেজনার বশে কার্য্যের পরিণামের দিকে দৃষ্টি যায় নাই।

পতিতা নারীদের মধ্যে যাহারা এইরূপে পর-পুরুষের অবৈধ প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া কুপথে আসে, তাহাদের সকলের ভাগ্যেই এই দশা ঘটে। সেই পুরুষটী অবোধ বালিকার সর্ব্বনাশ করিয়া অল্প সময়ের মধ্যেই তাহাকে ছাড়িয়া যায়। এমন কোন পতিতা নারী নাই, যে আমরণ তাহার প্রথম প্রণয়ীর সহিত বাস করিতেছে। অভিজ্ঞতা হইতে ইহার যুক্তিসঙ্গত কারণ আমি দেখাইয়া দিতেছি।

অবৈধ প্রেম উত্তেজনার বশেই জন্মে। উত্তেজনা মাত্রই ক্ষণস্থায়ী ও তাহা কদাচ বিচার বুদ্ধি প্রসূত নহে। সুতরাং যে প্রেম অল্পেতেই জন্মে—তাহা অল্পেতেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। এই প্রকার অবৈধ প্রেমে মিলিত নারীপুরুষের বিচ্ছেদের কারণ—একের বা উভয়েরই দোষ অথবা অবস্থার পীড়ন। অর্থাভাব, গর্ভসঞ্চার, রূপ-বিকৃতি, এই সব হইল অবস্থার পীড়ন। মদ্যপানের অভ্যাস, অপরের প্রতি আসক্তি এই সব হইল নারী পুরুষের দোষ।

আমাদের ব্যাপারে দুই-ই ঘটিয়াছিল। রমেশদার মদ্যপান ও আমার অসময়ে সন্তান সম্ভাবনা আমাদের বিচ্ছেদের কারণ। যদি রমেশদা হিন্দুর সামাজিক রীতি অনুসারে আমাকে বিবাহ

করিয়া আমার স্বামী হইতেন, তবে তিনি কখনই আমাকে পরিত্যাগ করিতে পারিতেন না। আর কিছু না হউক—শেষকালে একটা আইনের ভয়ও থাকিত—লোকলজ্জা ও সমাজ শাসন না হয় ছাড়িয়াই দিলাম। অবৈধ প্রেমে যেমন মিলনের স্বাধীনতা আছে—তেমনি বিচ্ছেদের স্বাধীনতাও আছে। তাই রমেশদা অনায়াসে আমাকে ছাড়িয়া গেলেন। সমাজ আজ রমেশদাকে প্রশংসাই করিবে। আমিই হইয়াছি নিন্দার ভাগী। রমেশদা আমাকে শেষ কথা সত্যই বলিয়া গিয়াছেন।

তারপর, এত দুঃখ ভোগ করিয়াও আমার শিক্ষা হয় নাই। মোহান্তজীর আশ্রমে এমন পুণ্যের বাতাসের মধ্যে থাকিতেও দুষ্প্রবৃত্তির অঙ্কুর আবার আমার হৃদয়ে দেখা দিয়াছে। সয়তানের প্রলোভন সুখ-স্বর্গের ছবি লইয়া আমার সম্মুখে আসিল। আমি তাহাতে মুগ্ধ হইলাম।

ষষ্ঠ

দেহ বিক্রয়

যে সকল স্ত্রীলোক পাপ পথ ছাড়িয়া সদ্ভাবে জীবন যাপন করিতে ইচ্ছুক, তাহারা এই উদ্ধার আশ্রমে স্থান পাইত। কোন প্রকার শিল্প কার্য্যাদির দ্বারা জীবিকা অর্জ্জনের উপায় তাহারা অবলম্বন করিত। আবার এমন স্ত্রীলোকও সেখানে ছিল, যাহারা নিতান্ত দায়ে পড়িয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছে। উহারা আমার মত এইরূপ ঘটনা চক্রে জড়িত—সমাজ অথবা পরিবারে তাহারা

যাইতে পারে না। তাহাদের জীবনের গতি অস্থির। উদ্ধার আশ্রমে খাওয়া-পরা পাইয়াই যে তাহারা সুখী, আমার তাহা বোধ হইল না। ইহাদের সকলেই কিশোরী বা যুবতী। আমি যখন সেখানে গিয়াছিলাম, তখন প্রায় ১৩।১৪ জন স্ত্রীলোক ছিল, তন্মধ্যে জন পাঁচেক প্রৌঢ়া বিধবা ব্যতীত আর সকলেই এই শ্রেণীর।

আমি ক্রমশঃ বুঝিতে পারিয়াছিলাম, যে সকল স্ত্রীলোক স্বেচ্ছায় অথবা কু-লোকের প্ররোচনায় ঘরের বাহির হইয়া আসে—অন্নবস্ত্রের অভাবই তাহাদের প্রধান বিপদ নহে। 'কি খাইব'—এই চিন্তা অপেক্ষা 'কি রূপে থাকিব' এই ভাবনাই তাহাদের বেশী করিতে হয়। কলিকাতা সহরে স্ত্রীলোকেরা নানাপ্রকার ব্যবসায় ও চাকুরীতে নিযুক্ত হইতে পারে। তাহাতে গ্রাসাচ্ছাদনের উপযুক্ত অর্থ উপার্জ্জন করা যায়। কিন্তু আমি দেখিয়াছি ঐ সকল ব্যবসায় ও চাকুরী যে সকল স্ত্রীলোক অবলম্বন করিয়াছে তাহাদের মধ্যেও অনেকে প্রায় পতিতা নারীর পথে চলিতেছে। ইহার কারণ, তাহারা কখনও বিবাহিত জীবনের সংযমের মধ্য দিয়া আসে নাই। পানওয়ালী, মেস্ বোর্ডিং হোটেলের বা গৃহস্থ বাড়ীর ঝি চাকরাণী, বাজারের মাছ তরকারী ফল মূল প্রভৃতি বিক্রয়-কারিণী, রাঁধুনি, কারখানার মজুরাণী, মশলা ঝাড়াই বাছাই-ওয়ালী, থিয়েটারের অভিনেত্রী, কীর্ত্তনওয়ালী, শুশ্রূষাকারিণী, সঙ্গীত-শিক্ষয়িত্রী, প্রসবকারিণী দাই, মেয়ে ডাক্তার, রেলের টিকিট আফিসে ও টেলিফোনের মেয়ে কেরাণী—ইহারা সকলেই স্বীয় জীবিকা নির্ব্বাহের উপযুক্ত অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারে এবং ইচ্ছা করিলে পবিত্র জীবন যাপন করিতে পারে; কিন্তু

তাহা সকল সময়ে হয় না। বহুদিনের অভিজ্ঞতায় আমি একথা বলিতেছি।

উদ্ধার আশ্রমের কর্ত্তৃপক্ষদের নিকট আমি পিতার পরিচয় ও বাড়ীর ঠিকানা সমস্তই গোপন করিয়াছিলাম। তাঁহারা শুধু এইমাত্র জানিলেন, আমি উচ্চ বংশীয় ব্রাহ্মণের মেয়ে। কুমারী অবস্থায় কোন দুষ্ট লোক আমাকে ঘরের বাহির করিয়া নিয়াছিল। সে গর্ভাবস্থায় আমাকে ছাড়িয়া পলাইয়াছে। রমেশদার নামও আমি প্রকাশ করিলাম না। আমি লেখাপড়া কিছু জানি, ইহা প্রকাশ হইল।

বৃন্দাবন হইতে কলিকাতা আসিতে আমার খুব আগ্রহ জন্মিয়াছিল। তাহার কারণ, আমি আশা করিয়াছিলাম, আর যাহাই হউক অন্ততঃ মুকুলদা ও কমলাকে দেখিতে পাইব। অকুল সমুদ্রে এই দুইটী বন্ধু আমার তৃণ-স্বরূপ। কিন্তু উদ্ধার আশ্রমে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, তাহাদের খবর পাওয়া সহজ ব্যাপার নহে।

শীঘ্রই কয়েকটী সমবয়সী মেয়ের সঙ্গে আমার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মিল। ইহাদের মধ্যে রাজবালা ও কালীদাসী এই দুইজন ছিল প্রধান। ইহাদের কথা এই পুস্তকের স্থানে স্থানে আরও কয়েক-বার উল্লেখ করা হইবে। সুতরাং ইহাদের একটু পরিচয় দিতেছি। রাজবালা সোণার-বেণের মেয়ে। বাপের বাড়ী কলিকাতায়, অল্পবয়সে তাহার বিবাহ হইয়াছিল। পিতা ও শ্বশুর উভয় পরিবারই সঙ্গতিপন্ন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বিবাহের এক বৎসর পরেই হতভাগিনী বিধবা হয়। তৎপরে পিতার প্রতিবেশী এক পূর্ব্ববঙ্গবাসী কায়স্থ যুবকের সহিত তাহার গুপ্ত প্রণয় জন্মে

রাজবালার এক জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃবধূ এই ব্যাপারে তাহাকে গোপনে সাহায্য করিত। যুবকটী স্বদেশী আন্দোলনের সময় খুব "বন্দে মাতরম্" করিয়া বেড়াইত। তিন বৎসর ধরিয়া এই গুপ্ত প্রেম-লীলা চলিতে থাকে। অবশেষে রাজবালার সন্তান-সম্ভাবনা হওয়ায় প্রেমিক যুবক পলায়ন করে। রাজবালা ঝিয়ের সহিত গঙ্গাস্নানের অছিলায় বাড়ীর বাহির হইয়া আসে। আর সে ফিরিয়া যায় নাই। তারপর নানা দুঃখ দুর্দ্দশার আবর্ত্তে ঘুরপাক খাইতে খাইতে এই উদ্ধার আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছে।

কালীদাসী সধবা, কামারের মেয়ে। সে রূপসী ছিল। বর্দ্ধমান জেলার কোন পল্লীগ্রামে তাহার শ্বশুর ঘর। স্বামীর নিকট হইতে দুর্ব্বৃত্তেরা তাহাকে বলপূর্ব্বক অপহরণ করে। তাহারা এক বৎসর ধরিয়া তাহাকে নানাস্থানে ঘুরাইয়া বেড়ায়। ইহা লইয়া মামলা মোকদ্দমা হইয়াছিল। কিন্তু মোকদ্দমার পরে কালীদাসীর স্বামী তাহাকে গ্রহণ করিল না। তাহার এক আত্মীয়ের পরামর্শে সে পতিতাবৃত্তি অবলম্বন করিতে যাইতেছিল। বর্দ্ধমান সহরের কোন উকীল জানিতে পারিয়া তাহাকে এইখানে পাঠাইয়া দেন।

ক্রমশঃ বুঝিতে পারিলাম, উদ্ধার আশ্রমটী আমাদের পক্ষে নিরাপদ স্থান নহে। অন্নবস্ত্রের কোন ক্লেশ নাই। আমাদের মধ্যে যাহারা রূপযৌবন সম্পন্না, তাহাদের প্রতি কর্ত্তৃপক্ষের মধ্যে কাহারও কাহারও একটু বিশেষ দৃষ্টি। আমার উপর তাঁহাদের শীঘ্রই অনুগ্রহ পড়িল। আমাকে কাজ কর্ম্ম করিতে হইত না। আমার থাকিবার ঘর বিবিধ আসবাব পত্রে সজ্জিত হইল। আমি অতিশয় প্রীত হইলাম। আমার ভাল কাপড় চোপড়, দামী জামা

সেমিজ, পরিপাটী বিছানা। অন্যান্য মেয়েরা কেহ কেহ আমাকে এজন্য ঈর্ষা করিত। রাজবালা ও কালীদাসী আমাকে দেখিলেই মুচ্‌কি হাসিয়া বলিত, "এবার তোর ভাই কপাল ফিরেছে।"

কর্ত্তৃপক্ষদের মধ্যে একজন আমার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হইলেন। আমিও ধরা দিলাম। তিনি আমার ঘরে মাঝে মাঝে রাত্রি যাপন করিতেন। জানিলাম, আমার মেয়ে-বন্ধুদের গৃহেও কর্ত্তৃপক্ষদের অপর কেহ কেহ গোপনে যাতায়াত করিয়া থাকেন। এইরূপে কিছুদিন অতীত হইল।

একদিন আমি আমার গুপ্ত প্রণয়ীর নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিলাম। কিন্তু তিনি সম্মত হইলেন না। আমার সমবয়সী মেয়েরা মিলিয়া মাঝে মাঝে আমাদের গুপ্ত প্রণয়ের কথা তুলিয়া হাস্য পরিহাস করিত। রাজবালা ও কালীদাসীর সহিত প্রাণের কথা হইত। আমার পরামর্শে উহারা দু'জনেও বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছিল। কিন্তু কোন ফল হইল না। আমি বলিলাম "ভাই, যদি রূপ, যৌবন বেচ্‌তে হয়, তবে লুকিয়ে চোরের মত কেন—একেবারে বাজারে নেমে দর যাচাই করে উপযুক্ত মূল্যে বিক্রয় করব।" রাজবালা ও কালীদাসী সেইদিন হইতে তাহাদের প্রণয়ীদিগকে আর ঘরে প্রবেশ করিতে দিল না। আমিও তাহাই করিলাম। আমাদের উপর নানা উৎপীড়ন ও অত্যাচার আরম্ভ হইল। আমরা স্থির করিলাম, উদ্ধার আশ্রমে আর থাকিব না, কিন্তু আমরা নিরাশ্রয়—নিঃসহায়, কোথায় যাই।

তখন ইউরোপে মহাযুদ্ধ ভীষণভাবে চলিতেছে। ভারতবর্ষ হইতে বহু সংখ্যক শুশ্রূষাকারিণী নারী আহত সৈন্যদের সেবার জন্য

যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়াছে। সেই জন্য কলিকাতা বোম্বাই প্রভৃতি বড় বড় সহরের হাসপাতাল গুলিতে নার্সের কাজ করিবার লোকের অভাব ঘটিয়াছে। আমাদের আশ্রমে সংবাদ পত্র আসিত। আমি বাংলা খবরের কাগজ হইতে পড়িয়া অন্যান্য মেয়েদের শুনাইতাম।

রাজবালার মাথায় কি এক মতলব আসিল। সে একদিন আমাকে বলিল "আয় ভাই, আমরা নার্সের কাজ শিখি।" আমি বলিলাম "আশ্রমের কর্ত্তৃপক্ষ সে ব্যবস্থা না করিলে ত হয় না।" শ্রীযুত—দাস মহাশয় একদিন আশ্রম পরিদর্শন করিতে আসিলে রাজবালা তাঁহাকে এই সকল বিষয়ে কথা বলিল। তিনি শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলেন এবং আমাদিগকে প্রাথমিক কিছু শিক্ষা দিবার নিমিত্ত একজন ডাক্তার নিযুক্ত করিলেন। কালীদাসী লেখাপড়া জানিত না। তাহাকে শিখাইয়া লইবার ভার আমার উপর পড়িল। তিন মাসের মধ্যেই সে খুব উন্নতি দেখাইল। মাঝে মাঝে আমাদিগকে হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হইত। সেখানে আমরা ডাক্তার নানাবিধ যন্ত্র ও ঔষধাদির নাম শিখিতাম।

গুপ্ত প্রণয়ীরা আমাদিগকে তখনও ছাড়ে নাই। তাহাদের অত্যাচারে একেবারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলাম। একটা মেয়ের উপর একদিন পাশবিক অত্যাচারের উপক্রম করায় সে নিজেকে বাঁচাইবার জন্য পাশের বাড়ীতে লাফাইয়া পড়ায় তাহার পা ভাঙ্গিয়া যায়,এ জন্য মোকদ্দমাও হইয়াছিল, কিন্তু তাহার ফলাফল শুনি নাই। একদিন সন্ধ্যার পরে আমি, রাজবালা, কালীদাসী ও আর একটী মেয়ে (তাহার নাম এখন আমার মনে নাই—বোধ হয় খেঁদি বা এমন কিছু

হইবে) এই চারিজন একখানি ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিয়া টালীগঞ্জে আসিলাম। সেখান হইতে ট্রামে আমরা কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা মন্দিরে উপস্থিত হইলাম।

এই স্থানটী আমার পরিচিত ছিল। বাল্যকালে পিতার সহিত এই উপাসনা মন্দিরে অনেকবার আসিয়াছি। আজ সেই কথা মনে পড়িয়া চক্ষে জল আসিল। উপাসনা শেষ হইয়াছে। সমবেত উপাসকগণ প্রায় সকলেই চলিয়া গিয়াছেন। কেবল কয়েকজন বিশিষ্ট লোক অপেক্ষা করিতেছিলেন। আমাদের ব্রাহ্ম মহিলার মত কাপড় পড়া ছিল; পায়ে জুতাও ছিল, আমরা অগ্রসর হইয়া গেলাম।

ব্রাহ্ম সমাজে আসিবার ষড়যন্ত্র আমরা অনেক দিন হইতেই করিতেছিলাম। রাজবালাই ইহার মূল কারণ। সে বলিয়াছিল ব্রাহ্ম সমাজ সকলকেই গ্রহণ করে, ব্রাহ্ম ধর্ম্ম অবলম্বন করিলে বিবাহ করা সহজ হইবে। কিন্তু শেষে আমরা দেখিলাম, সেখানেও বাধা আছে।

সম্মুখে একজন পক্ক-কেশ-শ্মশ্রু বিশিষ্ট দীর্ঘাকৃতি বলিষ্ঠদেহ বৃদ্ধকে দেখিয়া রাজবালা আমার কানে কানে বলিল "এই বুঝি কৃষ্ণ কুমার মিত্র—প্রণাম কর।" আমরা চারি জনেই পাদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলাম। তিনি স্নেহপূর্ণ স্বরে আমাদের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, আমরা তাঁহাকে একপাশে ডাকিয়া নিয়া সকল কথা বলিলাম, এবং আমাদের রক্ষার উপায় করিতে অনুরোধ করিলাম। উদ্ধার আশ্রমের কর্ত্তৃপক্ষদের দুর্ব্ব্যবহার ও আমাদের ব্রাহ্ম ধর্ম্ম গ্রহণের অভিলাষ তাঁহাকে জানাইলাম।

তিনি বলিলেন "আপনাদের রক্ষার উপায় একাকী আমার দ্বারা

সম্ভবপর হয় না। সমাজের অন্যান্য ব্যক্তিগণকে জিজ্ঞাসা করাও প্রয়োজন।” তৎপরে তিনি একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোককে নিকটে ডাকিলেন। তাঁহার নিকট সমস্ত ঘটনা বলা হইলে তিনি বিশেষ ঘৃণার সহিত আপত্তি জানাইয়া কহিলেন—“না তা কিরূপে হয়? ইহাদের পূর্ব্বজীবন কলুষিত। ব্রাহ্ম সমাজে কি পাপ প্রবেশ করিবে?” আমরা নিরাশ হইয়া চলিয়া আসিলাম। বিদায় লইবার সময় পুনঃ প্রণাম করিতে গেলে শ্রীযুত কৃষ্ণ কুমার মিত্র মহাশয় আমাদের প্রণাম গ্রহণ করিলেন; কিন্তু অপর লোকটী, পরে শুনিয়াছিলাম তাঁহার নাম হেরম্ব বাবু—“না—না” বলিয়া সরিয়া গেলেন। এই ভদ্র লোকটীর সহিত পরে আমার আর একবার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাহা বলিলে তিনি দুঃখিত হইতে পারেন মনে করিয়া বলিলাম না।

আমরা ভাবিতে লাগিলাম এখন কোথায় যাই। উদ্ধার আশ্রমে আর আমাদিগকে নেবেনা। সেখানে ফিরিয়া যাওয়াও আমাদের ইচ্ছা ছিলনা। হঠাৎ আমার কমলার কথা মনে হইল। তাহার বাড়ীর ঠিকানা আমি জানিতাম। অন্ততঃ দুই একদিন সেখানে থাকিতে পারিব, এইরূপ ভরসা হইল। একখানা ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিয়া আমরা চারিজনেই বাগবাজারে কমলার বাড়ীর দিকে রওনা হইলাম।

কিন্তু সেখানে যাইয়া দেখি, কমলা তাহার মাতার সহিত কোথায় চলিয়া গিয়াছে। তাহারা সে বাড়ীতে নাই। অন্যলোক ভাড়াটে রহিয়াছে। তাহারা কমলাদের কোন সন্ধান দিতে পারিল না; আমি যেন একেবারে বজ্রাহত হইলাম। দীর্ঘকাল পরে নানা দুঃখ ভোগের পর বাল্যকালের প্রিয়বন্ধু কমলাকে

দেখিব বলিয়া মনে বড়ই আনন্দ হইয়াছিল—কিন্তু সে আশা যে এরূপভাবে বিনষ্ট হইবে, তাহা কখনও মনে করি নাই। আমি মাথায় হাত দিয়া ভাবিতে লাগিলাম।

মুকুলদার ঠিকানা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। কমলার সন্ধান তাঁহার কাছে পাওয়া সম্ভব ছিল। আর কি উপায় আছে? রাজবালা বলিল "ভাই আজ রাত্রির মত আমি তোমাদিগকে একটা পরিচিত জায়গায় রাখিতে পারি। তারপর কাল সকালে যাহা হয় করা যাইবে।" আমরা অগত্যা সম্মত হইলাম। তখন রাত্রি অনেক হইয়াছে।

সেই ঘোড়ার গাড়ীতে আরও বেশী ভাড়া দিয়া আমরা চাঁপাতলায় হাড়কাটা গলিতে এক পতিতা নারীর গৃহে আশ্রয় লইলাম। এই স্ত্রীলোকটী রাজবালার পূর্ব্ব জীবনের পরিচিতা। সে সমস্ত বাড়ীটা নিজে ভাড়া লইয়া তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন ঘরে বেশ্যা ভাড়াটে বসাইয়াছিল। তাহাতে তাহার কিছু লাভ হইত। এতদ্ভিন্ন পাপ ব্যবসায়ে উপার্জ্জন ছিল। এই প্রকার স্ত্রীলোককে পতিতা নারী সমাজে 'বাড়ীওয়ালী' নামে অভিহিত করা হয়। ইহাকে সকলে রাণী বাড়ীওয়ালী বলিয়া ডাকিত।

রাজবালাকে অনেকদিন পরে পাইয়া, বিশেষত: তাহার সঙ্গে আমাদের তিনজনকে দেখিয়া বাড়ীওয়ালী অতিশয় আনন্দিত হইল; সে পরম যত্নের সহিত আমাদের সকলকে একটী ঘরে থাকিতে দিল, তাহাতে বিছানা পত্রেরও অভাব ছিল না। আমাদের কিছু খাবার ব্যবস্থাও হইল। রাজবালার সহিত বাড়ীওয়ালী নানা কথাবার্ত্তা বলিতে আরম্ভ করিল।

দুশ্চিন্তায় আমার মনে শান্তি নাই। জীবনে এই প্রথম আমি ব্যবসাদার খাঁটী বেশ্যার ঘরে প্রবেশ করি। আমার কেমন একটা অস্বস্তি বোধ হইতেছিল। নীচের তলায় এক কোণে ঘর —আলো বাতাস নাই। চারিদিকে একটা নূতন রকমের দুর্গন্ধ। কোথাও মাতালের বমি, কোথাও গান বাজনা— কোথাও হৈ হৈ চীৎকার, কোথাও গালাগালি, ঝগড়া, এই সব দেখিয়া শুনিয়া আমার হৃদয় দমিয়া গেল; অথচ এখান হইতে পলাইয়া কোথায় যাইব তাহাও জানিনা।

পরদিন সকালে খেঁদি বলিল, বেলিয়াঘাটায় তার এক মাসীর বাড়ী আছে, সে সেখানে যাইবে। আমরা আপত্তি করিলাম না। সে চলিয়া গেল। আমরা আরও তিন চারি দিন সেই বাড়ীতে রহিলাম। ইতিমধ্যে বাড়ীওয়ালী আমাকে ও কালীদাসীকে নানা প্রকারে বুঝাইয়া বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিতে মত লওয়াইল। সেই চতুরা নারীর সঙ্গে আমি তর্কে পারিলাম না। সে যে সকল যুক্তি দেখাইল তাহার সার মর্ম্ম এই—বেশ্যারা স্বাধীন; ভগবান তাহাদিগকে রূপ দিয়াছেন— পুরুষকে ভুলাইবার কৌশল দিয়াছেন কিসের জন্য?—তাহা দ্বারা জীবিকা উপার্জ্জন করিতে। উকীল তাহার বুদ্ধি বিক্রয় করে—পণ্ডিত তাহার বিদ্যা বিক্রয় করে—এমন কি দীক্ষাগুরুও মন্ত্র বিক্রয় করেন; তবে রূপবতী কেন দেহ বিক্রয় করিবে না? বিপদ ভয় সকল ব্যবসায়েরই আছে। দেশের বড় বড় লোক সমস্ত বেশ্যাদের পায়ে বাঁধা। ধনী লোকদের টাকা বেশ্যাদের ঘরে উড়িয়া আসিয়া পরে। তাহাদের একটা কটাক্ষের মূল্য সহস্র টাকা।

আমি ভুলিলাম। বাড়ীওয়ালী আমার জন্য ঘর দেখিতে লাগিল, কালীদাসী সেই বাড়ীতেই ঘর নিল। আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের উপরে যেখানে এখন সিটিকলেজের বাড়ী তৈয়ারী হইয়াছে, তাহার নিকটে এক বস্তীতে আমি ও রাজবালা দুইখানি খোলার ঘর ভাড়া লইলাম। রাণী বাড়ীওয়ালী আমাদের দুই-জনকেই কিছু টাকা ধার দিয়া জিনিষপত্র ও কাপড়-চোপড় সমস্ত জোগার করিয়া দিল।

কুসঙ্গে কিরূপ অধঃপতন হয়, আর এক দিক দিয়া তাহা দেখিতে পাইলাম। আমার স্কুলে পড়া বিদ্যা সমস্ত ভুলিয়া যাইবার গতিক হইল। মুকুলদার কাছে কত নূতন বিষয় শিখিয়াছিলাম—সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতি এখন সব চাপা পড়িয়া গেল। আমি যাহাদের সঙ্গে ছিলাম .তাহারা কেহ লেখাপড়ার চর্চ্চা করিত না। কেবল কা'র কয়টা লোক জুটিয়াছে—কা'র প্রণয়ীর সঙ্গে কি আলাপ হইল—আর যত সব অশ্লীল ব্যাপার, ইহাই ছিল প্রধান আলোচনার বিষয়। তারপর নিজেদের রান্না ও ঘরের কাজ সমস্ত করিতে হইত। আমরা লজ্জায় বাজারে যাইতাম না। অন্য কাহাকেও দিয়া বাজার করাইতাম।

লম্পট প্রণয়ীকে পতিতা সমাজে 'বাবু' বলা হয়। এখন হইতে আমি এই শব্দটী মাঝে মাঝে ব্যবহার করিব। এই 'বাবু' লইয়া খুব গোলযোগ হইত। কোন পতিতার প্রণয়ী অন্য নারীর ঘরে প্রবেশ করিলে তাহা লইয়া তুমুল ঝগড়া বিবাদ বাঁধিয়া উঠিত। সকলেই তাহাতে যোগ দিত। আমিও বাদ যাইতাম না। আর যত রকমের অশ্লীল অশ্রাব্য কথা শুনিতে

শুনিতে আমার সহিয়া গিয়াছিল। বুঝিলাম স্কুলের পড়া হইতে যে অল্পবিদ্যা পাইয়াছি তাহা আমার অহঙ্কার বাড়াইয়া সর্ব্বনাশ করিয়াছে—কিন্তু আমাকে পাপের আক্রমণ হইতে বাঁচাইতে পারে নাই।

আমরা সন্ধ্যার পরে সাজিয়া গুজিয়া আরতি দেখিবার ছলে নিকটবর্ত্তী ঠন্‌ঠনিয়া কালিবাড়ীতে যাইতাম। সেখানে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া যখন দেখিতাম আমরা কোন ভদ্রবেশধারীর নজরে পড়িয়াছি, তখন বাড়ীর দিকে যাত্রা করিতাম। সেই ভদ্রবেশ-ধারী ব্যক্তিও আমাদের সঙ্গ লইত। এইরূপে শিকার ধরিবার কৌশল রাণী বাড়ীওয়ালী আমাদিগকে শিখাইয়াছিল।

আমি প্রথমে যাইতে আপত্তি করিতাম। আমার ভয় ছিল যদি বাপের বাড়ীর কাহারও সাঙ্গ দেখা হয়। যদি নন্দদাদা, সেই হরিমতি ঝি, অথবা বাবার মোটর ড্রাইভার, এমন কি বাবা নিজেই যদি দেখিয়া ফেলেন! রাজবালা আমাকে সাহস দিয়া বলিল "তোমাদের বাড়ী এ পাড়ায় নয়—সেত এখান হইতে অনেক দূরে; কলিকাতার মত সহরে কে কার খবর নেয়। এ পাড়ার লোক ও পাড়ায় যায় না।" আমিও বুঝিলাম তাহাই; অবশেষে আমি সাবধানে রাজবালার সহিত বাহিরে যাইতাম। আমার আর একটা আশা ছিল, যদি মুকুলদাকে কখনও রাস্তায় দেখি। কারণ আমার মনে পরে তাঁহার বাড়ী এ পাড়াতেই ছিল।

একদিন শীতের রাত্রিতে ঠন্‌ঠনিয়া কালিবাড়ী হইতে ফিরিবার সময় দেখিলাম একজন ভদ্রলোক মাথায় র‍্যাপার জড়াইয়া আমাদের পিছু পিছু আসিতেছেন। আমাদের বাড়ী

পর্য্যন্ত আসিয়া তিনি রাজবালার ঘরে গেলেন। পরদিন রাজবালা আমাকে ডাকিয়া বলিল কাল রাত্রিতে যে লোকটী আমার ঘরে এসেছিল তিনি কে জানিস্?—বৈঠকখানার বাজারের কাছে কি একটা কলেজ আছে সেই কলেজের তিনি বড় প্রফেসার, তাঁহার নাম শ্রী......। তিনি আরও দুই তিন দিন আমার ঘরে এসেছিলেন।" আমিত নাম শুনিয়া অবাক্। এঁর কথা মুকুলদার মুখে কতবার শুনিয়াছি। ইনি খুব ভাল পড়ান। আমি ভাবিলাম এই প্রফেসারের নিকট হইতে মুকুলদার কোন খবর পাওয়া যায় কিনা দেখিব।

রাণী বাড়ীওয়ালী আমাদের বাড়ীতে মাঝে মাঝে আসিত; আমরা তাহকে রাণীমাসী বলিয়া ডাকিতাম। ক্রমে আমার ভয় দূরে গেল। আমি দেখিলাম অন্য সকল স্ত্রীলোক আমোদ-প্রমোদে মত্ত থাকে—নিঃসঙ্কোচে চলাফেরা করে—গঙ্গাস্নান, কালীঘাটে, যেখানে সেখানে নির্ভয়ে যায়। তাহারা আমাকে বুঝাইল এখন আর ভয় করিস কাকে? গবর্ণমেণ্টের কাছে যখন একবার নাম রেজেষ্টারী করিয়েছিস—যখন একবার বলেছিস যে স্বেচ্ছায় এই বৃত্তি নিয়েছি, তখন আর কে তোকে কি বলবে? নাচতে নেমে লজ্জা কর্‌লে চলবে কেন?

রাণীমাসী বলিল তোমার পিতা যখন মনে করেন তুমি মরিয়াছ, তিনি যখন তোমার আর ঘরে নিবেন না, তুমিও তাঁর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা কচ্ছনা, তবে আর পিতাকেই বা ভয় কিসের? আমি বলিলাম, তবু পিতা যদি দেখেন তাঁর কন্যা তাঁর সম্মুখে পাপ ব্যবসা কর্‌ছে, তাঁর মনে দুঃখ হয় না?" রাণীমাসী কহিল, তিনি কন্যাকে ঘরে নিয়া অনায়াসে সেই দুঃখ থেকে

রক্ষা পেতে পারেন। মা, এ পথে যখন এসেছ, তখন অনেক নূতন চিত্র তোমার চোখে পর্‌বে। দেখ্‌বে সত্যই পিতার সম্মুখে কন্যা বেশ্যাবৃত্তি কর্‌ছে—দেখ্‌বে সত্যই গর্ভধারিণী মাতা আপন কন্যাকে বেশ্যাবৃত্তি করবার জন্য নিত্য সাজিয়ে গুজিয়ে দিচ্ছে—দেখ্‌বে সত্যই ভ্রাতা, ভগ্নী, আত্মীয়স্বজন বেশ্যার উপার্জ্জিত অর্থে আত্মপোষণ কর্‌ছে। পতিতা শুধু আমরা নই—প্রায় সমস্ত সমাজই অধঃপতিত হয়েছে।"

আমি ও রাজবালা কোন উত্তর না দিয়া নীরবে শুনিতেছিলাম। রাণী-মাসী পুনরায় বলিতে লাগিল, "মানী, কোন দিন হয়ত দেখ্‌বে তোমার নন্দদাদাই তোমার ঘরে উপস্থিত হয়েছে। তোমার মুকুলদাও আস্‌তে পারে। মনে কিছু করো না মা, আমি স্বরূপ কথা বল্‌ছি, কোন দিন হয়ত আমার ঘরেই তোমার পিতার সহিত সাক্ষাৎ হওয়া অসম্ভব নহে।

আমি লজ্জায় জিভ কাটিলাম। রাজবালা মাথা নীচু করিল, রাণীমাসী বলিতে লাগিল, "আর কি বল্‌ব মা, সে দিন যে একটি স্ত্রীলোক রামবাগান থেকে আমার বাড়ীতে এসেছিল, তাকেত তোমরা দেখেছ। তার ইতিহাস শুন্‌বে? তার পিতা ......ভট্টাচার্য্য; কলিকাতার কোন কলেজের খুব বড় অধ্যাপকের কাজ কর্‌তেন। বেশী বয়সে কাজ ছেড়ে দিয়ে এখন রামবাগানে আপন রক্ষিতার গর্ভজাত কন্যার সহিত অবৈধ প্রণয়ে আসক্ত হয়ে শেষকালটা কাটাচ্ছেন—এই ত অবস্থা। আমি অনেক দেখেছি অনেক শুনেছি, তোমরাও দেখ্‌বে।

আমরা যে বাড়ীতে ছিলাম, সেই বাড়ীতে একটি স্ত্রীলোকের

ঘরে একদিন দেখি সে একদিন একটা ছবিকে ফুলের মালা দিয়া সাজাইতেছে। স্ত্রীলোকটীর বয়স কিছু বেশী—সৌন্দর্য্য তখনও রহিয়াছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ছবিখানি কার? সেই স্ত্রীলোকটী বলিল, উহা ৺শিবনাথ শাস্ত্রীর ছবি। তিনি ব্রাহ্ম সমাজের একজন প্রধান আচার্য্য ছিলেন। আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম "ওহো—সেই শিবনাথ শাস্ত্রী, যাঁর 'নিমাই সন্নাস' কবিতা আমরা স্কুলে কত মুখস্থ করেছি—না—

আজ শচীমাতা কেন চমকিলে,
ঘুমাতে ঘুমাতে উঠিয়া বসিলে?
লুণ্ঠিত অঞ্চলে 'নিমু' 'নিমু' বলে
দ্বার খুলি মাতা কেন বাহিরিলে?—

বাবার মুখেও এঁর নাম মাঝে মাঝে শুন্‌তাম। তার পর আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "শিবনাথ শাস্ত্রীর ছবি তুমি তোমার ঘরে রেখেছ কেন?" সে বলিল "আমি যখন ১৭।১৮ বৎসরের মেয়ে তখন এক প্রৌঢ়া পতিতা নারী আমাকে আশ্রয় দেয়। তাহার ছোট দুইটী ছেলে ছিল। তাহার প্রণয়ী বাবু তাহাকে একখানি বাড়ী দান করেন। রূপ-যৌবন বিক্রয় লব্ধ অর্থে আত্মপরিপোষণ করবার জন্যই সেই স্ত্রীলোকটি আমায় এনেছিল। সে চাঁপাতলার কোন ছুতারের মেয়ে, ৭ বৎসর বয়সে বিধবা হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় ও শিবনাথ শাস্ত্রী তাহার পুনঃ বিবাহ দিতে চেয়েছিলেন। নানা কারণে তাহা হয়নি। শিবনাথ শাস্ত্রীকে সে বাল্যকালে দাদা বলে ডাক্‌ত। অবশেষে ঘটনা চক্রে সে বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করল। আমি তাহার আশ্রয়ে আস্‌বার পর একদিন শিবনাথ

শাস্ত্রী সেই বাড়ীতে আসেন এবং তাহাকে বেশ্যাবৃত্তি পরিত্যাগ কর্‌বার জন্য অনেক উপদেশ দেন। কিন্তু তাহাতে ফল হয় নাই। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে সেই স্ত্রীলেকটীর হৃদয়ে অনুতাপ জন্মে। তখন আমি তাহার বাড়ীতে ছিলাম। আমি তাহাকে মা বলে ডাক্‌তাম। সে শিবনাথ শস্ত্রীর এই ছবিখানা তখন কিনে আনে। প্রতিদিন সে ইহাকে ফুল দিয়ে সাজিয়ে পূজা করত। মর্‌বার সময়ে সে আমাকে এই ছবিখানা দিয়ে গেছে এবং যত দিন বাঁচি এম্‌নি করে ফুল দিয়ে সাজাতে বলেছে। তার মৃত্যুর পর সেই দুই ছেলে বাড়ী দখল নিয়ে আমায় তাড়িয়ে দিয়েছে। আমি এখন এইভাবে আছি।"

আমি বলিলাম "শিবনাথ শাস্ত্রী এত বড় উদার-চরিত্র, পাপীকে উদ্ধার কর্‌বার জন্য বেশ্যালয়ে আস্‌তে ঘৃণা বোধ করেন নি?" স্ত্রীলোকটী ছবিখানিকে প্রণাম করিয়া বলিল, তিনি অনেক পতিতাকে সৎপথে এনেছেন। ঢাকার এক পতিতা নারীর কন্যা লক্ষ্মীমণিকে তিনি উদ্ধার করে এক ব্রাহ্ম যুবকের সহিত বিবাহ দিয়েছিলেন, সে গল্পও আমি শুনেছি।" আমি বলিলাম "আর এখন ব্রাহ্ম সমাজ কি হয়েছে! আমরা সেদিন স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করে আশ্রয় নিতে গেলুম, তারা আমাদের নিলে না। হেরম্ব বাবু নামে একজন, (পরে শুনেছি তিনি হেরম্বচন্দ্র মৈত্র) আমরা 'পাপী বলে' আমাদের প্রণাম পর্য্যন্ত গ্রহণ করলেন না। বোধ হয় আজ শিবনাথ শাস্ত্রী বেঁচে থাকলে আমাদের এ দশা হ'ত না।"

এই অস্বাস্থ্যকর খোলার ঘরে থাকিবার ফলে আমার শরীর দিন দিন খারাপ হইতে লাগিল। রণী-মাসীর পরামর্শে গর্ভসঞ্চার

নিরোধ করিবার জন্য একটা ঔষধ খাইয়াছিলাম—তারপর হইতে আমার নানা রোগ দেখা দিল। রাজবালাও সেই ঔষধ খাইয়াছিল, কিন্তু তার কোন অসুখ হইল না। আমি অতিশয় ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িলাম। সমস্ত শরীরে বেদনা। হাত পায়ের তলায় বিশ্রী দাগ—মুখে গায়ে ফুস্কুরীর মত হইয়া যন্ত্রণা-দায়ক ক্ষত উৎপন্ন হইল। রাণী-মাসী দেখিয়া বলিল, হাসপাতালে না গেলে আর রক্ষা নাই।

আমি জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়াছিলাম। বিছানায় পড়িয়া দিবারাত্রি অবিরত কাঁদিতাম। চক্ষের জলে বালিশ ভিজিয়া যাইত। সেইবার রোগে ভুগিয়া বুঝিয়া ছিলাম, মরণে বোধ হয় সুখ আছে। আত্মীয় বন্ধু কেহ নাই। বাড়ীর অন্য স্ত্রীলোক সকলে নিজ নিজ কার্য্যে ব্যস্ত। সন্ধ্যার পর সকলকেই ব্যবসায়ের খাতিরে দরজায় দাঁড়াইতে হয়। তারপর সারা রাত্রি অনিদ্রায় মদ্যপানে অথবা নানা প্রকার উত্তেজনায় কাটাইয়া তাহারা বেলা ৮ টা ৯ টায় ঘুম হইতে উঠে। আমাকে কে দেখবে? চারিদিকে একটা বিভৎস ব্যপার আমার চক্ষে পড়িল। আমরা যেন শূকরীর দল—কাদায় গড়াগড়ি দিতেছি। বুঝিলাম এবার আমার মৃত্যু নিশ্চয়।

রাণী-মাসী ও রাজবালা দুজনে মিলিয়া আমাকে হাসপাতালে দিয়া আসিল। তিন মাস পরে সুস্থ হইয়া আমি বাড়ী ফিরিলাম। তখন আমার হাতে একটী পয়সাও নাই।

সপ্তম

সমাজ চিত্র

বৃন্দাবনে সেই মোহন্তজী আমায় বলিয়াছিলেন, "অন্নবস্ত্রের দয়া তুমি অনেক পাবে।" তাঁহার কথাটী যে সত্য, এই প্রমাণ আমি জীবনে বার বার পাইয়াছি। দারিদ্র্য হইতে রক্ষা পাওয়া কঠিন নহে—কিন্তু প্রবৃত্তির আক্রমণ হইতে কেহ বাঁচাইতে পারে না। অধিকন্তু সেই রাক্ষসীর গ্রাসে ঠেলিয়া দিবার লোক অনেক আছে।

রাণী-মাসী এবার আমাকে তাহার নিজের বাড়ীতে লইয়া গেল। সেখানে দোতলায় একখানা ভাল ঘর খালি হইয়াছিল। আমি তখন বুঝি নাই, এই প্রকার দয়ার কার্য্যই আমাদিগকে সর্ব্বনাশের পথে টানিয়া নেয়।

আমার যে বিদ্যা ছিল, তাহাতে আমি কাহারও বাড়ীতে ছোট ছেলে মেয়েদের পড়াইতে পারিতাম, টেলিফোন আফিসে কাজ করিতে পারিতাম—নার্সের কাজ করিতে—গান শিখাইতে পারিতাম, কিন্তু এই সকল সৎপথে অর্থ উপার্জ্জন করিবার প্রবৃত্তি এবং সুযোগ কেহ আমাকে দেয় নাই। কেবল রূপযৌবনের পসরা লইয়া বাজারে ঘুরিবার দুর্ম্মতি রাণী-মাসী আমার হৃদয়ে জাগাইয়া দিতে লাগিল।

আমি বলিলাম, "রাণী-মাসী, আমার দেহকান্তি মলিন হয়েছে। অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ক্ষীণ, বিশুষ্ক। মাথার চুলের আর সে পূর্ব্বের শোভা নাই। আমার দ্বারা এই পথে আর কি উপার্জ্জন হবে?" রাণী-মাসী আমাকে বুঝাইল; "'পতিতার রূপই প্রধান সম্পত্তি নহে। লম্পটেরা রূপ দেখিযা মোহিত হয় না। দেখ্‌বে অতি কুরূপা বেশ্যা, সুন্দরীদের অপেক্ষা অধিক অর্থ উপার্জ্জন কচ্ছে। এই জন্যে বলে যার সঙ্গে যার মজে মন।' পুরুষগুলি যখন সন্ধ্যাবেলা বেশ্যা পল্লীতে ঘুরে বেড়ায় তখন কন্দর্পঠাকুর তাদের চোখে ধাঁধাঁ লাগিয়ে দেন।"

রাণী-মাসী আমাকে কতকগুলি কৌশল শিখাইল। কাপড় পড়িবার ফ্যাশান, দাঁড়াবার ভঙ্গী, কথা বলিবার কায়দা, চলিবার রীতি, এসব কিরূপ হইলে লোক আকৃষ্ট হয় সে তাহা দেখাইয়া দিল। মনে দারুণ দুঃখ ও অপ্রীতির কারণ থাকিলেও আগন্তুক পুরুষের সঙ্গে হাসিয়া কথা কহিতে হইবে। এমন ভালবাসা দেখাইবে—তাহা যে কপট, তাহা কেহ যেন ধরিতে না পারে। প্রণয়ী মদ্যপানাসক্ত হইলে তাহার মন রক্ষার জন্য কিরূপে মদের গ্লাস ঠোঁটের কাছে ধরিয়া মদ্যপানের ভাণ করিতে হয় তাহা দেখিয়া লইলাম। লম্পটদের মধ্যে যে ব্যক্তি যে প্রকারের আমোদ চায় তাহাকে তাহাই দিতে হয়। এই প্রকার প্রতারণা শিক্ষা করিতে করিতে আমার বোধ হইল, যেন আমার হৃদয়ের মধ্যে একটা নূতন মানদাম সৃষ্টি হইতেছে।

আমি ভাল গাহিতে পারিতাম। গলার স্বরও আমার বেশ সুমিষ্ট ছিল, একথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এ বিদ্যাটী পতিতার জীবনে

খুব কাজে লাগে। রাণী মাসী অমেকে গান শিখাইবার জন্য একজন ভাল ওস্তাদ রাখিল। সে বলিল, "তোমার ব্রহ্ম সঙ্গীত অথবা স্বদেশী গান ত এখানে চল্‌বে না। লপেটা, হিন্দি গজল অথবা উচ্চ অঙ্গের খেয়াল ঠুংরা এসব হ'ল বেশ্যা মহলের রেওয়াজ। কীর্ত্তনও শিখিতে পার।" আমি তিন চারি মাসের মধ্যেই সঙ্গীত শিক্ষায় উন্নতি দেখাইলাম। কীর্ত্তন শিখিতে কিছু দেরী হইল।

ছলনা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে লোক চিনিবার বিদ্যাও শিখিতে হইয়াছিল। কে চুরির মতলবে আসিয়াছে—কে কুৎসিত রোগাক্রান্ত—কে দুষ্ট প্রকৃতির লোক, কে ভালমনুষ ও সরলচিত্ত, এ সকল আমাদিগকে মুখ দেখিয়া ধরিতে হয়। অনেক সময়ে বিপদেও পড়িয়াছি। একদল লোক আছে, তাহারা বেশ্যা বাড়ীতে ডাকাতি করিয়া বেড়ায়। কখনও কখনও বেশ্যাকে হত্যাও করিয়া থাকে। এমনিভাবে প্রাণটী হাতে লইয়া পতিতা নারীকে ব্যবসা করিতে হয়। দু-পাঁচ টাকার জন্য কোন নারী একেবারে অপরিচিত পুরুষকে গ্রহণ করে—হয়ত সেই বিশ্বাসঘাতক স্ত্রীলোকটীর বুকে ছুরি বসাইয়া তাহার গহনাপত্র লইয়া পলায়ন করিল। হতভাগিনী আর চক্ষু মেলিল না। পতিতারা পাপের শাস্তি এইরূপেও হাতে হাতে পায়।

আমার ঘরে একটী ভদ্রলোক আসিতেন। তিনি কলিকাতার একজন ভাল চিকিৎসক। আজ পর্য্যন্ত তিনি নাকি বিবাহ করেন নাই। তাঁহার নিকট আমি অনেক উপকার পাইয়াছি। আমার শরীর যাহাতে শীঘ্র সারে, সেইজন্য তিনি খুব ভাল ভাল

ঔষধ আমাকে দিয়াছিলেন। চিকিৎসাতেও তাঁহার অসাধারণ নৈপুণ্য ছিল। তাঁহার মত একজন চিকিৎসককে এত বেশী টাকা দর্শনী দিয়া আনান আমার পক্ষে অসম্ভব। তিনি যেদিন দুই তিন ঘণ্টা আমার ঘরে বসিতেন, সে দিন আমাকে দশ বিশ টাকা দিতেন। কখনও কখনও সন্ধ্যার পরে আমাকে মোটরে লইয়া বেড়াইতে বাহির হইতেন—গ্রাণ্ড হোটেল, গঙ্গার ধারে অথবা ইডেন গার্ডেনে বেড়াইয়া আমরা অধিক রাত্রিতে বাড়ী ফিরিতাম, সেদিন আমি ৫০৲ টাকা পাইতাম। তাঁহার অনুগ্রহে আমার মাসে প্রায় দুইশত টাকা উপার্জ্জন হইত।

রাণী-মাসী আমাকে সাবধান করিয়া বলিল "মা, রোজগার যা পার এইবেলা করে নাও। শেষ বয়সের কথা মনে রেখো। এখন থেকে কিছু না জমাতে পার্‌লে ভবিষ্যৎ জীবনে কষ্ট পাবে। দেখছে ত-এপথে বন্ধু-বান্ধব কেহই নাই। একমাত্র টাকাই সব।" আমি এই চিকিৎসক মহাশয়ের অনুগ্রহ পাইয়া অন্যদিকে রোজগারে একটু ঢিলা দিয়াছিলাম। রাণীমাসী বুঝিয়াছিল, এই বাবু চিরদিন থাকিবেন না। তার অনুমান মিথ্যা হয় নাই।

সেই বৎসর আশ্বিন মাসে পূর্ব্ববঙ্গে ভীষণ ঝড় তুফান হয়; তাহাতে বহুলোকের প্রাণনাশ ঘটে। লোকের ঘর বাড়ী, বাগান শস্যক্ষেত্র সমস্ত নষ্ট হইয়া যায়। তাহাদের দুর্দ্দশা মোচনের জন্য কলিকাতায় এক সাহায্য ভাণ্ডার খোলা হয়। বিখ্যাত ব্যারিষ্টার ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী ও চিত্তরঞ্জন দাশ (উভয়েই এখন পরলোকে) এই সৎকার্য্যে অগ্রণী হ'ন। তাঁহাদের চেষ্টায় বহু সহস্র টাকা সংগৃহীত হইতে থাকে। যুবকেরা রাস্তায় রাস্তায় গান গাহিয়া

ভিক্ষা করিত। বেশ্যা-পল্লীতেও তাহারা আসিত। আমরাও সেই সাহায্য ভাণ্ডারে যথাসাধ্য অর্থ দিয়াছি।

একদিন আমার সেই চিকিৎসক বাবু আমাকে বলিলেন "মানী, তোমারা পতিতা নারীরা মিলে যদি কিছু চাঁদা তুলে ঐ ইষ্টবেঙ্গল সাইক্লোন ফণ্ডে পাঠাও, মিঃ সি, আর, দাশ তা'হলে বিশেষ সন্তুষ্ট হ'বেন। তাঁর ইচ্ছা, এই সৎকার্য্যের জন্য সমাজের সকল স্তরেই সাড়া পড়ুক। কি বল—পারবে?"

আমি বলিলাম—"দেখুন, আমি ত এ পথে নূতন। সকলের সঙ্গে চেনাশুনা নাই। আপনি ভরসা দিলে আমার যতদূর সাধ্য করব।" তিনি বলিলেন, "রামবাগান, সোনাগাছি, ফুলবাগানে আমর জানাশুনা আরও কয়েকজন মেয়ে মানুষ আছে—থিয়েটারের অভিনেত্রীদেরও এর মধ্যে আনা যায়।"

চিকিৎসক মহাশয়ের সঙ্গে নাকি মিঃ সি, আর, দাশের পরিচয় ছিল, তাঁহার ও কতিপয় বন্ধুর চেষ্টায় কলিকাতার বেশ্যা পল্লী হইতে কয়েক সহস্র টাকা চাঁদা উঠিল। জনসাধারণের কার্য্যে এই আমার প্রথম যোগদান। এই সুযোগে আমি মিঃ সি, আর, দাশকে প্রথম স্পর্শ করিয়াছিলাম। আমরা যখন প্রণাম করিয়া তাঁহার পায়ে টাকার তোড়া রাখিলাম, তখন আনন্দাশ্রুতে তাঁহার বক্ষ প্লাবিত হইল। তিনি আমাদের মস্তক স্পর্শ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। বুঝিলাম তিনি সত্যই দেশবন্ধু।

রাজবালার সহিত একদিন দেখা করিতে গিয়া দেখি, তাহার ঘরে খুব ভাল দামী আসবাব পত্র আসিয়াছে। একখানা পালঙ্ক, দেওয়াল আয়না, বুক্‌কেস্ এই সব জিনিষে ঘর সাজান

রহিয়াছে। বিছানার জন্য গদী তৈয়ার হইয়াছে। তাহার গায়ে কিছু নূতন গহনাও দেখিলাম। রাণী-মাসীর টাকা সে পরিশোধ করিয়াছে; তাহার নিজের হাতে কিছু নগদ টাকাও জমিয়াছে। খোলার ঘরে থাকিয়া বেশ্যাদের এত অর্থ উপার্জ্জন হয়, আমার পূর্ব্বে ধারণা ছিলনা। আমি ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে রাজবালা কহিল "নানাপ্রকার লোক বেশ্যালয়ে আসে। যাহারা ধনী জমিদারের ছেলে, তাহারা বন্ধুবান্ধব লইয়া প্রকাশ্যে বেশ্যাদের নিকটে যায়। লোক-লজ্জা, ভয় ইহাদের নাই। ইহারা মদ্যপান, গান-বাজনা প্রভৃতি আমোদ প্রমোদে লিপ্ত হয়। ছোটখাট খোলার ঘরে ইহাদের পদার্পণ হয়না। রামবাগান, সোনাগাছিই তাহাদের প্রধান তীর্থক্ষেত্র। আর একদল লম্পট আছে, যাহারা সমাজের নিন্দার ভয় করে—যাহারা উচ্চপদস্থ ব্যক্তি বলিয়া সম্মানিত, তাহারা একাকী গোপনে বেশ্যাগৃহে আসে। কেবলমাত্র প্রবৃত্তির তাড়নাই ইহাদের আসিবার কারণ। গান বাজনা, বা অপর কোন আমোদ প্রমোদ ইহারা চাহেনা। লুকাইয়া লুকাইয়া ইহারা আসিয়া চলিয়া যায়—এদিকে লোক সমাজেও নিজেদের মান মর্য্যাদা ও সুনাম রক্ষা করে। কবি, সাহিত্যক, সমাজ সংস্কারক, নামজাদা উকিল—স্কুলের মাষ্টার, কলেজের প্রফেসার,—রাজনীতিক নেতা, উপনেতা, গবর্ণমেণ্ট আফিসের বড় কর্ম্মচারী, ব্রাহ্ম, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত, বিদ্যাভূষণ, তর্কবাগীশ প্রভৃতি উপাধিধারী অধ্যাপক, পুরোহিত, মোহান্ত, গুরুগিরি ব্যবসায়ী এই সকল লোক এই শ্রেণীর। আমার ঘরে একজন হাইকোর্টের বিখ্যাত উকীল আসেন। তিনি অতি উচ্চবংশীয় ভদ্র সন্তান।

তাঁহার নাম শ্রী......। বয়স একটু বেশী। তিনি আমাকে অনেক টাকা দেন। আমি সেই বাবুকে একদিন ঠাট্টা করে' বলেছিলাম, তুমি হাইকোর্টের উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত হ'বে। আমার সেই কথা ফলে গেছে। তিনি সত্যসত্যই হাইকোর্টে উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত হন। তিনি খুসী হ'য়ে আমায় এই সব জিনিষ পত্র কিনে দিয়েছেন। আমার এই দামী আংটীটা তাঁহারই উপহার।"

রাজবালার সহিত কথা কহিতে কহিতে সন্ধ্যা অতীত হইল। আমি চলিয়া আসিব বলিয়া উঠিয়াছি এমন সময় একজন লোক রাজবালার ঘরে প্রবেশ করিল। রাজবালা সেই লোকটাকে আদর অভ্যর্থনা করিয়া বসাইল। আমি বাহিরে আসিয়া অস্ফুট স্বরে রাজবালাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "ইনি কে?—এঁকে ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মত দেখাচ্ছে।" রাজবালা বলিল "ইনি আমার এক বাবু। খুব বড় অধ্যাপক। ইনি মহামহোপাধ্যায় উপাধিধারী পণ্ডিত। ইনি আজকাল আমায় নিয়ে খুব মজেছেন। তবে শুনেছি এঁর একটা দোষ আছে—নিত্য নূতন চাই। বেশ্যা মহলে ইনি সুপরিচিত। খোলার ঘরেই এঁর যাতয়াত বেশী। আমি যতদূর পারি ক'সে আদায় ক'রে নিচ্ছি—কি জানি আবার কোন্‌দিন সরে পড়্‌বে।"

কিছুদিন পূর্ব্বে কালিদাসী হাড়কাটা গলির বাড়ী ছাড়িয়া রামবাগানে উঠিয়া গিয়াছে। সে একজন ধনবান ভাটিয়া সওদা-গরের নজরে পড়িয়াছিল। একদিন কালীদাসীর নূতন বাড়ীতে যাইয়া দেখি তা'র অতুল ঐশ্বর্য্য হইয়াছে। তেতলায় দু'খানি বৃহৎ ঘর—একখানি বসবার, একখানি শোবার। ইলেকট্রীক্

লাইট, পাখা, পালঙ্ক, বুককেস্, বৃহৎ আয়না, ছবি, মার্ব্বেল পাথরের টেবিল, মেজেতে লিনোলিয়াম পাতা, শুভ্র ফরাস্ বিছানা কোমল তাকিয়ায় শোভিত—রূপার পানের থালা, এস্ট্রে। কৃষ্ণনগরের সুন্দর মাটীর পুতুলে আলমারি সাজান। তিন সেট জড়োয়া গহনা—দুই সেট তোলা,—একসেট গায়ে। দামী বেনারসী সাড়ী ও ব্লাউজ তাহার বেড়াইবার পোষাক; শান্তিপুর ফরাসডাঙ্গার দেশী সাড়ী তাহার আটপৌরে কাপড়। তাহার ভাটিয়া বাবু তাহাকে মাসিক ৩০০৲ টাকা নগদ দিত। এতদ্ব্যতীত ঘর ভাড়া ও খাওয়াপরার খরচ চালাইত।

কালীদাসীর এই সৌভাগ্য আলাদিনের প্রদীপের মত দুই তিন মাসের মধ্যে হইয়াছে। আমি দেখিয়া একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। কি উজ্জ্বল আশার আলোক আমি সম্মুখে দেখিতে পাইলাম! কোন্ সয়তান আমার অন্তরের মধ্যে বার বার জাগিয়া বলিতে লাগিল, এমন সৌভাগ্য তোমারও হ'তে পারে। আমি সেই আলেয়ার পশ্চাতে ছুটিলাম।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি কালীদাসী রূপসী ছিল। এখন ভালভাবে থাকিবার ফলে তাহার সৌন্দর্য্য আরও ফুটিয়া বাহির হইল। পাড়াগাঁয়ের মেয়ে হলেও কালীদাসী গান জানিত। আমিও তাকে কিছু শিখাইয়াছিলাম। এ বাড়াতে তাহার এক মা জুটিয়াছে। কালীদাসী বলিল এই স্ত্রীলোকটিই তাহাকে এই ভাটিয়া বাবু যোগাড় করিয়া দিয়া হাড়কাটা গলি হইতে রামবাগানে আনিয়াছে। কালীদাসী আমাকেও ঐ পাড়াতে যাইতে পরামর্শ দিল। আমি সুযোগ অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম।

রাণী-মাসীর পাওনা আমি প্রায় শোধ করিয়াছিলাম, আমার আর কোন ঋণ ছিলনা। ঘরের জিনিষপত্র চলনসই রকম হইয়াছে। এই সময়ে আমার সঙ্গে একজন ভদ্রলোকের পরিচয় হয়। তিনি ব্রাহ্মণ যুবক, কোন ব্যাঙ্কের বিশিষ্ট কর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁহার নাম শ্রী......পাধ্যায়। দুই তিন দিন আমার ঘরে আসিয়া তিনি আমার প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। আমার গানেই তাঁহাকে বিশেষ রূপে মুগ্ধ করিল।

তিনি আমাকে স্থানান্তরে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিলেন। তিনি বলিলেন "আমি তোমাকে একটু উঁচু ষ্টাইলে রাখতে চাই। হাড়কাটা গলিটা অতি অভদ্রের যায়গা—এখানে যত ছোট লোকের আমদানী।" আমি মনে মনে কহিলাম "হায়রে বেশ্যার আবার ভদ্রাভদ্র বিচার—পতিতার উচ্চ নীচ স্তর বিভাগ—এদেরও জাতিভেদ!' এখনই অন্য স্থানে উঠিয়া গেলে আমার চিকিৎসক বাবুটিকে হারাইব এই ভাবিয়া আমি সম্মত হইলাম না। প্রকৃত কথা গোপন করিয়া বলিলাম, "আমার দেনাপত্র আছে—বাড়ীওয়ালীও কিছু টাকা পাবে, উঠ্‌তে হলে দু'চার মাস পরে উঠা যাবে।"

এই ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারী মাঝে মাঝে আমার গৃহে রাত্রি যাপন করিতেন। তাঁহার সঙ্গে দুই একজন বন্ধুবান্ধবও আসিত। কেহ সমান্য পরিমাণে মদ খাইতেন। তবে নিত্যান্ত মাতাল কেহ ছিলেন না। আমি কখনও কখনও লুচি, পরোটা, মাছ, মাংস প্রভৃতি সুখাদ্য প্রস্তুত করিয়া তাহাদিগকে খাওয়াইতাম। এইরূপে ক্রমে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাইল। আমার এই বাবুটীর খুব পান খাওয়া

অভ্যাস ছিল। সোনালী রূপালী তবক দেওয়া দামী পান সর্ব্বদা তিনি খাইতেন। তিনি বড় সৌখীন পুরুষ ছিলেন। ব্যাঙ্কের বিশিষ্ঠ কর্ম্মচারী বলিয়া তিনি একখানি সুন্দর বৃহৎ মোটর গাড়ী পাইয়াছিলেন। তাহাতে চড়িয়া তিনি আমার গৃহে আসিতেন। আমরা তাঁহার মোটরে অনেকবার বেড়াইয়াছি।

আমি কিছুদিন দুই দিক রক্ষা করিতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু তাহা হইয়া উঠিল না। আমার চিকিৎসক বাবু বুঝিতে পারিলেন যে, আমি অন্য প্রণয়ীর হাতে পরিয়াছি। তিনি ক্রমশঃ কম আসিতে লাগিলেন। শেষে আসা একদম বন্ধ করিলেন। আমার পাধ্যায় বাবু সর্ব্বদাই আমাকে এ পাড়া ছাড়িয়া যাইতে বলিতেন। আমার দেনাপত্র শোধ করিবার নাম করিয়া তাঁহার নিকট হইতে পাঁচশত টাকা নগদ আদায় করিলাম। আর নূতন বাড়ীতে যাইয়া বসিতে আরও অতিরিক্ত দুইশত টাকা লাগিবে, বলিলাম। তিনি সেই টাকাও দিলেন। আমি রামবাগানে কালীদাসীর বাড়ীর নিকটেই একটী বাড়ীতে দু'খানি ভাল ঘর ভাড়া লইলাম।

আমার সেই চিকিৎসক বাবুটি এক্ষণে একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি তিনি তখন পর্য্যন্ত বিবাহ করেন নাই। পতিতার ব্যাবসায় প্রথম আরাম্ভ করিয়া আমি অবিবাহিত যুবকদিগকেই একটু বেশী পছন্দ করিতাম। আমার বিশ্বাস ছিল গৃহে তাহাদের পত্নীর আকর্ষণ না থাকাতে তাহারা পতিতার প্রতি বেশী আসক্ত হইবে। কিন্তু এই দীর্ঘ কালের অভিজ্ঞতায় আমার সেই ভ্রান্তি দূর হইয়াছে। আমি দেখিয়াছি, যাহারা নিজের স্ত্রীকে ভালবাসে তাহারা নিজের রক্ষিতা নারীকেও ভালবাসে। অবিবাহিত যুবকেরা

প্রায়ই চঞ্চল চিত্ত এবং তাহারা কাহারও উপর নিজের মনকে স্থিরভাবে বসাইতে পারে না।

আমার চিকিৎসক বাবুটী আমাকে ছাড়িয়া অনেক নারীর প্রতি আসক্ত হইয়াছেন—সে সংবাদও আমি শুনিয়াছি। এমন কি গৃহস্থের ঘরেও তিনি নাকি কেলেঙ্কারী ঘটাইয়াছেন। খবরের কাগজে সেই ইঙ্গিত দিয়াছে। সত্য মিথ্যা ভগবান জানেন।

রামবাগানে আসিয়া আমার সুখে স্বচ্ছন্দে কাল কাটিতে লাগিল। কিন্তু আমার একটা দুঃখ মাঝে মাঝে প্রাণে জাগিয়া উঠিত। মুকুলদা অথবা কমলার কোন সংবাদ পাইতাম না। পিতা, মাতুল বা নন্দদাদা ইঁহাদের দেখা পাইতে আমার ভয় হইত; দেখা না হওয়াই বাঞ্ছনীয় ছিল। কিন্তু কমলা মুকুল-দা এই দুই জন ত আমার পাপ জীবনের গতির সূচনা জানে। সুতরাং তাহাদের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইত। পতিতার জীবন কিরূপ বিপদগ্রস্ত তাহা এই অল্প সময়েই আমি বুঝিয়াছি। আর সকলে আমায় ঘৃণা করে করুক—পায়ে ঠেলিয়া ফেলে ফেলুক—মুকুল-দা ও কমলা কখনও আমায় পরিত্যাগ করিতে পারিবে না, এ বিশ্বাস আমার দৃঢ় ছিল।

রামবাগানে আসিয়া আমি পড়াশুনায় মন দিলাম, বাবুকে বলিয়া পুস্তক রাখিবার জন্য একটা আলমারী কিনিলাম। বাংলা ইংরাজী সাহিত্য গ্রন্থাদি তাহাতে সাজাইলাম। বাবু আমার জ্ঞান-পিপাসা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। মাসিক সংবাদপত্র প্রবাসী ও ভারতবর্ষ তিনি আমায় কিনিয়া দিতেন। দৈনিক খবরের কাগজ তিনি আফিস হইতেই লইয়া আসিতেন। আমি তাহা পড়িতাম।

গানে, পড়াশুনায়, বাবুর ভালবাসায় আমার মন একপ্রকার সাময়িক স্থিরতা লাভ করিল।

এই সময়ে সাহিত্য ক্ষেত্রে একটা যুগান্তর আসিয়াছে—তাহার সহিত আমাদের পতিতা জীবনের নিকট সম্বন্ধ আছে বলিয়া এস্থলে তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। কুলটার চরিত্র লইয়া বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় ও তাঁহার সমসাময়িক সাহিত্যিকগণ যে চিত্র আঁকিয়া গিয়াছেন, তাহাতে কুলটার প্রতি ঘৃণার ভাবই বদ্ধমূল হয়। কৃষ্ণ-কান্তের উইল, চন্দ্রশেখর প্রভৃতি উপন্যাসে কুলটার পরিণাম, ভীষণ শাস্তি ও প্রায়শ্চিত্তই দেখিতে পাই। এতাবৎকাল পতিতা নারীর জীবনের এমন দিক দেখান হইয়াছিল, যাহা দেখিয়া লোক পতিতার নারীর সংস্পর্শে যাইতে ঘৃণা বোধ করে—লজ্জিত হয় ও ভয় পায়। অমৃতলাল বসুর তরুবালা নাটকেও তাহাই দেখান হইয়াছে। তারপর রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কয়েকখানি উপন্যাসে কুলটার চরিত্রের অপর এক দিক দেখাইয়াছেন, যাহাতে তাহার প্রতি লোকের সহানুভূতি জন্মে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যাহা অস্পষ্ট রাখিয়াছেন, শরৎ চট্টোপাধ্যায় ও নরেশ সেনগুপ্ত এবং বহু তরুণ সাহিত্যিক তাহা খুলিয়া দিয়াছেন। তাঁহারা কুলটা ও পতিতা নারীর কোন কোন চরিত্র এমনভাবে দেখাইয়াছেন, যাহাতে লোক তাহাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তাঁহারা বলেন "বেশ্যারা অসতী হইতে পারে—কিন্তু তাহারা মনুষ্যত্বের আদর্শে হীন নহে। পতিতা নারীও যখন সরল চিত্ত, ধর্ম্মপ্রাণ, ঈশ্বরভক্ত, দয়ার্দ্র হৃদয়, দানশীল হইয়া থাকে, তখন তাহারা ঘৃণার পাত্র হইবে কেন? দোষ সমাজের,—পতিতার নহে।"

এই সকল উপন্যাস ও কথা-সাহিত্য তরুণ যুবক যুবতীদের প্রাণে এক অপূর্ব্ব চঞ্চলতা জাগাইয়া তুলিল। তাহারা 'শ্রীকান্তের ভ্রমণ কাহিনী' পড়িয়া রাজলক্ষ্মীর মত পতিতা নারীর খোঁজ করিতে লাগিল,—শুভা পড়িয়া 'শুভ সঙ্গিনীর' মত অভিনেত্রীর সন্ধানে বাহির হইল। 'পরপারে' নাটকের সরযুকে পাইতে তাহারা পাগল হইল। আমার এই দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতায় বুঝিতে পারিয়াছি, বাঙ্গালার তরুণ যুবকের দল ক্রমশঃ অধিক সংখ্যায় কলুষ সংস্পর্শে আসিতেছে।

পতিতা নারীর জীবনের এই চিত্রকে নব্য সাহিত্যিকের দল রিয়্যালিষ্টিক আর্টের অন্তর্গত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এই আর্টের দোহাই দিয়া আজকাল সমাজের মধ্যে এক সর্ব্বনাশী বিষ ছড়ান হইতেছে। কলেজের উচ্চশিক্ষিত যুবকগণ নটের ব্যবসায় অবলম্বন করিতেছেন—সম্ভ্রান্ত বংশীয় জমিদার পুত্র আপন স্ত্রী কন্যা লইয়া প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে সহস্র সহস্র দর্শকমণ্ডলীর সম্মুখে অভিনয় দেখাইতেছেন—পিতামাতা কন্যাদিগকে থিয়েটারের ষ্টেজে নাচিতে পাঠাইতেছেন। স্বামী স্বকর্ণে শুনিতেছেন, তাঁহার স্ত্রী অভিনয়চ্ছলে অপরের সহিত প্রেম সম্ভাষণ করিতেছেন—পিতা দেখিতেছেন, কুমারী কন্যা রঙ্গমঞ্চে প্রেমের ছলা কলা শিখিতেছে। যিনি বিশ্বকবির উচ্চ আসন পাইয়াছেন, যাঁহার কাছে জগৎ মহৎ আদর্শের প্রত্যাশা করে, তিনি থিয়েটারে যাইয়া নটীদের গানের মহলা দেওয়াইতেছেন। যে ব্রাহ্ম সমাজের কাছে দেশ উচ্চ সুনীতির আদর্শ পাইতে চায়, তাহারাও আর্টের নেশায় মজিয়াছে। রবীন্দ্র ঠাকুর, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, লেডী অবলা বসু, শ্রীযুক্তা

কামিনী রায়, মিসেস্ বি, এল, চৌধুরী, সরলা দেবী ইঁহাদের মত লোকও ভদ্র ঘরের যুবতীদের নৃত্যের সমর্থন করেন। ইহা লইয়া সাময়িক সংবাদ পত্রাদিতে বহু বাদ প্রতিবাদ হইয়া গিয়াছে, আমি তাহা পাঠ করিয়াছি, আর জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিয়াছি।

আমার আত্মচরিত লিখিতে যাইয়া এত কথা বলিবার প্রয়োজন এই যে, আমাদের মত পতিতা নারীর জীবন যে অসংযম ও অসাবধানতার ফল, তাহা সমাজের প্রায় সকল স্তরে প্রবেশ করিতেছে। যাঁহারা সমাজের মঙ্গল চিন্তা করেন, তাঁহাদের দৃষ্টি এইদিকে আকৃষ্ট হউক, ইহা আমার অভিপ্রায় ও নিবেদন। যে অপরিনামদর্শী যুবকের কুহকে পড়িয়া আজ আমি পতিতা— এই প্রকার রাণী চুনীর প্রেমিক ও এই সকল নাচগানের কর্ণধার রূপে আছেন, তাহা কি অভিভাবকগণ খবর রাখেন ? নিজে মজিয়াছে বটে কিন্তু সমাজকে মজিতে দেখিলে দুঃখ হয়। আমাদের চুনীর বাবু-শিল্পীট......'সম্মিলনীর' একজন বিশেষ পৃষ্ঠপোষক। চুনীর নিকট এই সম্মিলনার দুই একটা অপবাদ শুনিয়াছি। সত্য মিথ্যা ঠিক না জানায় উল্লেখ করিলাম না।

নব্য সাহিত্যের এই রিয়্যালিষ্টিক আর্টের ফল আরও একদিকে দেখা দিল। পূর্ব্বে পতিতা নারী সৎকার্য্যে অর্থদান করিতে চাহিলে অনেকস্থলে তাহা গৃহীত হইত না। এমন কি মফঃস্বলের ভূম্যধিকারী পতিতার নিকট হইতে ভূমির করও নাকি গ্রহণ করিতেন না। ক্রমশঃ এই ভাব দূর হইতে লাগিল। এ বিষয়ে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন অতি উদার হৃদয় ছিলেন। জন সাধারণের হিতকর কার্য্যে তিনি শুধু পতিতার দান গ্রহণ করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না—

পতিতাদিগকে তিনি দেশ-হিতকর কার্য্যে আহ্বান করিয়াছিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল মহৎ, কিন্তু আমাদের মত নীচ দ্বারা তাঁহার উদ্দেশ্য সাধিত হইল না। ১১৯৮ সালের পর হইতে তাঁহার হস্তে ক্রমশঃ দেশের নেতৃত্ব ভার আসিতে থাকে। এ দিকে নব্য সাহিত্যও পতিতাদিগের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন ছিল। সুতরাং আমরা প্রকাশ্যে ভদ্র সমাজে মিশিবার একটা সুযোগ পাইলাম। ইহার ফল কি হইল, তাহা যথাস্থানে বিবৃত করিব।

জন সাধারণের হিতসাধন সম্বন্ধীয় রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনে প্রকাশ্যভাবে যোগদান করিবার বিষয় বলিবার পূর্ব্বে আমার জীবনের আর দুই একটী ঘটনা উল্লেখ করিয়া এই অধ্যায় শেষ করিতেছি।

আমাদের বাড়ীতে একজন স্ত্রীলোক একখানি ঘর ভাড়া লইল। সে সাত মাসের অন্তঃসত্বা ছিল। কিছুদিনের মধ্যে আমি তাহার অন্তরের সমস্ত কথা অবগত হইলাম। এই স্ত্রীলোকটী দরিদ্র কায়স্থ ঘরের বিধবা। তাহার গুরু শ্রী......বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাহার সর্ব্বনাশ করিয়াছেন। তিনি এখন আর কাছে ঘেঁসেন না। স্ত্রীলোকটী কলঙ্কের ভয়ে কোথাও আশ্রয় না পাইয়া বেশ্যা পল্লীতে আসিতে বাধ্য হইয়াছে। কারণ এই স্থান সকল কলঙ্ক ও পাপের ভাণ্ডার। আমি এই হতভাগিনীকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইলাম।

আমার পরামর্শে স্ত্রীলোকটী বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নিকট চিঠি লিখিল। সৌভাগ্যক্রমে কিছুদিন পরে বিদ্যাভূষণ মহাশয় আসিলেন। আমি নানা ছলে তাঁহার সহিত পরিচয় করিলাম।

এ বিষয়ে আমার ব্যাঙ্কের বাবুটীর নিকট প্রয়োজন মত উপদেশ লইয়াছি। একদিন আমি বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নিকট বিনয়ের সহিত অনুরোধ করিয়া বলিলাম, "দেখুন, এ বেচারী এখন দুঃসময়ে পড়েছে—আপনি যদি পরিত্যাগ করেন, এর উপায় কি হবে? কিন্তু তিনি আমার কথা উপেক্ষা করিলেন। তখন আমি উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলাম "মহাশয়, আমরা পতিতা নারী—আপনাদের ঘৃণিতা, আর আপনি সমাজের কর্ত্তা, আজ আমার কাছ থেকে আপনি তিরস্কার শুনে যেতে চান কি? ছিঃ, ছিঃ, আপনার লজ্জা হয় না? গুরুগিরি করতে গিয়ে সরল হৃদয় বিধবা শিষ্যানীর সতীত্ব নষ্ট করেছেন, দরিদ্রকে কলঙ্কে ডুবিয়েছেন। আপনি না স্মৃতি শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, আপনি না অধ্যাপনা করে থাকেন? আপনার পাণ্ডিত্যে ধিক্—আপনার শাস্ত্র জ্ঞানে শত ধিক্। আমরা মহাপাপী বারবণিতা, আমরা নরকে যাব, ইহা সত্য—আপনারা নরকে যাবেন না কেন জানেন?—আপনাদের জন্য এত বড় নরক কুণ্ড এখনও তৈরী হয়নি।" আমার কথা শুনিয়া বিদ্যাভূষণ মহাশয় চুপ করিয়া রহিলেন। আমি না থামিয়া,—তাঁর মুখের কাছে তর্জ্জনি হেলাইয়া ক্রুদ্ধস্বরে বলিলাম, "আপনি যেতে চান চলে যান। কিন্তু জানবেন আমি একে দিয়ে আদালতে নালিশ করে আপনার কাছ থেকে খোরপোষ আদায় করে ছাড়ব। জানি, আপনি অস্বীকার করতে পারেন। কিন্তু আমরা এ বাড়ীর সকলে সাক্ষ্য দিব যে আপনি এর ঘরে আস্‌তেন, এবং আপনার দ্বারা এর গর্ভসঞ্চার হয়েছে। আমরাতো কতই মিথ্যা বলি— যা'তে একজন নির্দ্দোষ নারীর উপকার

হয়—যাতে এক শঠ লম্পটের শাস্তি হয়, সেইরূপ মিথ্যা বল্‌তে আমাদের জিহ্বায় আটকাবেন।

বিদ্যাভূষণ মহাশয় বিশেষ কিছু না বলিয়া চলিয়া গেলেন, বুঝিলাম—তিনি ভয় পাইয়াছেন। কয়েক দিন পরে তিনি আসিয়া আমার হাতে একশত টাকা দিয়া বলিলেন "এর জন্য যা কিছু খরচ প্রয়োজন হয়, এই টাকা থেকে ক'র্‌বে"। আমি তাহা গ্রহণ করিলাম এবং স্ত্রীলোকটার প্রয়োজনার জিনিষ-পত্র যোগাড় করিয়া দিলাম। যথাসময়ে ইহার প্রসব হইল। বিদ্যাভূষণ মহাশয় প্রসূতি ও সন্তানকে আমাদের বাড়া হইতে সরাইয়া নিলেন। তারপর খবর লইয়া জানিয়াছিলাম, তিনি বিধবাটীকে বিশেষ অর্থ সাহায্য করেন নাই। এই লোকটার দুশ্চরিত্রের কথা অনেকেই জানিত। আরও কয়েকটী শিষ্যানীর সর্ব্বনাশ তিনি করিয়াছিলেন। আমি তাঁহার চাকুরীস্থলে বেনামী চিঠিতে সমস্ত রহস্য প্রকাশ করিয়া দিয়াছিলাম। এমন সর্ব্বনেশে লোকের শাস্তি হওয়া প্রয়োজন। পরে শুনিয়াছিলাম, তাঁহার ভাল ভাল চাকুরী সব গিয়েছে। সংবাদ পাইলাম, তিনি নাকি বৃদ্ধ বয়সে এক ষোড়শী বালার পানি গ্রহণ করিয়া তাঁহার অন্তরের যৌবন ক্ষুধা মিটাইতেছেন। সমাজের যে অংশ ছাড়িয়া আসিয়াছি, তাহার এমন গলিত ক্ষত দেখিয়া, পতিতাদেরও ঘৃণায় নাক সিটকাইতে হয়।

আমারদের বাড়ীর নিকটে সুশীলা নাম্নী এক বারবনিতা বাস করিত। সে এক নবাবের রক্ষিতা। তার বিপুল সম্পত্তি, অতুল ঐশ্বর্য্য। উহা আর বর্ণনা করিবার প্রয়োজন নাই। নবাব বহু লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া তাঁহার রাজধানীতে বিরাট প্রাসাদ

নির্ম্মাণ করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে তিনি থাকেন না। রাজধানী ছাড়িয়া কলিকাতায় এই রক্ষিতা বারনারীর নিকটেই অবস্থান করেন। এদিকে তাঁর সোনার পুরী শিয়াল কুকুরের আবাস স্থল হইতেছে, প্রজাগণের দুর্দ্দশার একশেষ—সুব্যবস্থা ও শাসনের অভাবে ঋণের পরিমাণ দিন দিন বাড়িতেছে। গরীব প্রজার রক্ত শোষণ করিয়া তাহা নটীর পূজায় ব্যয় করিতেছেন। নবাব বাদসার মত লোক পতিতার প্রেমে মজিবে, ইহাতে নূতনত্ব নাই। তবে এ কথা এখানে উল্লেখ করিলাম কেন! তাহার কারণ আছে; সুশীলার ঘরে যাইয়া প্রায়ই দেখিতাম নবাবের রাজধানী হইতে বহুমূল্য আসবাব পত্র, ছবি, পর্দ্দা, হীরা, জহরৎ, আয়না, গজদন্তের কারুকার্য্য-খচিত দ্রব্য'— এ সমস্ত আসিতেছে। ইহার কোন কোনটি বিক্রয় করা হইত—কোনটি বা সুশীলার ঘরেই শোভা পাইত। এই সকল দ্রব্য নবাবের পূর্ব্ব-পুরুষগণের কীর্ত্তি চিহ্ন স্বরূপ রাজধানীর পুরাতন প্রাসাদে সজ্জিত ছিল। ঐতিহাসিক কীর্ত্তি-দর্শনার্থীরা তাহা দেখিয়া অতীত গৌরবের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিত। একটা তুচ্ছ বেশ্যার মনস্তুষ্টির জন্য এই কীর্ত্তিচিহ্ন সমূহ কি মুর্খের মত ধ্বংস করা হইতেছে, তাহা ভাবিয়া আমি দুঃখ করিতাম। যাহারা পূর্ব্বপুরুষের প্রতি এমনি শ্রদ্ধাহীন, তাহারা পরাধীন হইবেনা ত হইবে কে?

সুশীলার বেড়াইবার জন্য মোটর গাড়ী ক্রয় করা হইয়াছে। সুশীলা নবাবের প্রধানা বেগমের চেয়ে অধিক ঐশ্বর্য্য—অধিক আদর যত্নে আছে। নবাব ঋণ করিয়া, মনি-মুক্তাদি বন্ধক রাখিয়া সুশীলার একহাজার টাকা মাসোহারা জোগাইতেছেন। ঋণের

দায়ে নবাব বাহাদুর মামলাতে জড়িত হইয়া কাঠগড়ায়ও দাঁড়াইতে বাধ্য হইয়াছিলেন ; শৈলশৃঙ্গে বজ্রাঘাত পড়িল।

আমি পতিতা নারী হইলেও রাজনৈতিক সংবাদ লইয়া থাকি। আজকাল যাঁহারা স্বাধীনতার কথা তুলিয়াছেন, তাঁহারা ভাবিয়া দেখুন, এদেশের নবাব বাদসার বংশধরেরা যদি স্বাধীনতার প্রিয়-স্মৃতিচিহ্ন সমূহ এমনি নির্ম্মম হৃদয়ে পতিতার কলুষিত প্রেমানল শিখায় আহুতি দেয়, যদি পূর্ব্বপুরুষের হাতের জিনিসের চেয়ে, বেশ্যার বিলোল কটাক্ষের মূল্য বেশী হয়, তবে স্বাধীনতার আশা কোথায় ? অপবিত্র আবর্জ্জনার স্তূপে স্বাধীনতার বিশাল বোধিদ্রুমের জন্ম হয়না।

— —

অষ্টম

অগ্নি ক্রীড়া

১৯২০ সালে সমগ্র ভারতে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হয়। বাংলাদেশে উহার পরিচালন ভার দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন গ্রহণ করেন। ছাত্রগণ স্কুল কলেজ ছাড়িবে—উকিল-ব্যারিষ্টার আইন ব্যবসায় পরিত্যাগ করিবেন, কেহ কাউন্সিলে যাইবে না—গবর্ণমেণ্টের উপাধি বর্জ্জন করা হইবে—বিদেশী দ্রব্য কেহ কিনিবে না ; এই পাঁচরকমের বয়কট্ সেই অসহযোগ নীতির মূল মন্ত্র ছিল। ইহার প্রচারের জন্য সমস্ত দেশে, গ্রামে গ্রামে

নগরে নগরে সভা সমিতি বক্তৃতা, পিকেটিং অর্থাৎ বিরোধকারী দিগকে বাধা দেওয়া চলিতে লাগিল, যুবকেরা স্বেচ্ছা-সেবকদল গঠন করিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। কর্ম্মী চাই—কর্ম্মী চাই এই রব উঠিল।

ভদ্র-মহিলাগণও পুরুষের সহিত কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সহধর্ম্মিণী পূজনীয়া শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবী তাঁহাদের নেত্রীর পদ গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা সহধর্ম্মী মহিলাদের মধ্যে উর্ম্মিলা দেবী, সুনীতি দেবী, সন্তোষ কুমারী দাশগুপ্তা, মোহিনী দেবী, হেমপ্রভা মজুমদার, বগলা সোম, উমা দেবী,ইহাদের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের পল্লীগ্রাম ও মফঃস্বল হইতেও বহু-সংখ্যক মহিলা কর্ম্মি আসিতে লাগিল। সে কি উৎসাহ—কি উদ্দীপনা, কি এক অপূর্ব্ব কর্ম্ম চঞ্চলতা দেখিয়াছিলাম। এইসকল মহিলা কর্ম্মীদিগকে সংঘবদ্ধ করিবার নিমিত্ত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন নারী-কর্ম্ম-মন্দির প্রতিষ্ঠা করিলেন। ইহার সম্বন্ধে পরে বলিব।

পুলিশ চারিদিকে খুব ধর-পাকড় আরম্ভ করিল। মহিলা কর্ম্মীরাও পুলিশের হাতে নিস্তার পান নাই। আমরা কয়েকজন পতিতা নারী মিলিয়া একটা ছোট দল গঠন করিলাম। আমাদের বাবুগণ পশ্চাতে থাকিয়া আমাদিগকে পরামর্শ ও উৎসাহ দিতেন। ইতিপূর্ব্বে ইস্টবেঙ্গল সাইক্লোন ফণ্ডের জন্য চাঁদা তুলিতে যাইয়া আমারা বাহিরের ভদ্রলোকদের সঙ্গে মিশিবার সুযোগ পাইয়াছি। তাহাতে আমাদের সাহস, চতুরতা ও দক্ষতা বাড়িয়াছিল। অনেক ছোট বড় দেশনেতার সহিত পরিচয় হইয়াছিল। এবার যখন আমরা পুনরায় কার্য্যক্ষেত্রে নামিলাম, তখন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের

সহকর্ম্মীরা অতিশয় সুখী হইলেন এবং আমাদিগকে বিবিধ প্রকারে সাহায্য করিলেন।

এই অসহযোগ আন্দোলনের উত্তেজনা এত তীব্র ও প্রবল হইয়া উঠিল যে, একসঙ্গে সকলে কাজ করিবার সময় মনে থাকিতনা যে, আমরা অস্পৃশ্য ঘৃণিত বেশ্যা—আব ইঁহারা সম্মানিত ভদ্র গৃহস্থ যুবক। সেই কর্ম্মী যুবকেরাও ভুলিয়া যাইত যে তাহারা বারবনিতার সহিত চলাফেরা করিতেছে। যে সকল পবিত্র-চরিত্র ব্যক্তি কখনও বেশ্যালয়ে আসেন নাই বা আসিবার কল্পনাও করেন নাই, তাঁহাদেব সঙ্গে আমরা এই অসহযোগ আন্দোলনের নেশায় মাতিয়া এক মোটব গাড়ীতে বেড়াইয়াছি, হাস্য পরিহাসের সহিত তাঁহাদের সঙ্গে কথাও বলিয়াছি। সকলে আমাদের স্বার্থত্যাগের প্রশংসা করিতেন—গর্ব্বের আনন্দে আমাদের বুক ফুলিয়া উঠিত।

একদিন কর্ম্মশেষে গৃহে ফিরিবার পূর্ব্বে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের নিকট বিদায় লইবার সময় তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। তিনি স্নেহভরে আমাদের আশীর্ব্বাদ করিলেন। একজন প্রৌঢ় ব্যক্তি সেইস্থানে বসিয়াছিলেন। আর কেহ ছিলেন না। আমরা যে বারবনিতার দল, তাহা তিনি বুঝিলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনকে তিনি প্রশ্ন করিলেন "শেষ কালে এরাও এসে কাজে নেমেছে—এটা কি ভাল হচ্ছে মিঃ দাশ ?" চিত্তরঞ্জন শ্লেষের সহিত উত্তর করিলেন "আপনারা হ'লেন রুচিবাগীশের দল। আমার সঙ্গে আপনাদের মিল্‌বে না। সঞ্জীবনী-সম্পাদক কেষ্ট মিত্তিরের কাছে যান। তিনি আপনাদের মনের মত লোক। কেশব সেনের সঙ্কীর্ণতা থেকে মুক্ত হ'য়ে উদার মত অবলম্বন করবার জন্য সাধারণ-ব্রাহ্ম-

সমাজের সৃষ্টি হ'ল; কিন্তু শেষে উহারই মধ্যেও ক্ষুদ্রতা দেখা দিল। কূপের মত এতটুকু হলে হবে না—সমুদ্রের মত প্রশস্ত বিশাল হ'য়ে সকলকে গ্রহণ করা চাই। পাশ্চাত্য দেশে কি দেখ্ছেন? আমাদেরও তাই কর্‌তে হবে। যাদের ঘৃণায় দূরে ঠেলে রেখেছি, তারাই আজ এগিয়ে আস্‌ছে। এ শুভলক্ষণ, আমি আস্তকুঁড়ের আবর্জ্জনায় এক অপূর্ব্ব শক্তির সন্ধান পেয়েছি।"

আমরা চলিয়া আসিলাম। তাঁহার তর্ক বিতর্ক কতদূর চলিয়াছিল জানি না। কিন্তু আজ দেখিতেছি, আমরা দেশবন্ধুর আশা পূর্ণ করিতে পারি নাই। আমরা সেই মহাপুরুষের সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দিয়াছি। তিনি মনে করিয়াছিলেন, দেশ সেবার অনলে আমাদের সকল পাপ দগ্ধ হইয়া যাইবে। তাহা হইল না। দেশকর্ম্মীদের সহিত বার-বনিতাদের এই প্রকার অবাধ মেলা-মেশার ফল ভাল হইল না।

আগুন লইয়া খেলা বড় বিপজ্জনক। সকলে তাহা পারে না। আমাদিগকে কর্ম্মক্ষেত্রে আনিয়া দেশ-নায়ক গণ ভুল করিয়াছিলেন। সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে একটা পতিব্রতার ভিত্তির প্রয়োজন। আমাদের তাহা ছিল না। আমরা শুদ্ধচিত্ত ও সংযত না হইয়াই একটা গুরুতর কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলাম। মিথ্যাচার, প্রতারণা, ছলনা, ইন্দ্রিয়পরতা এই সব হইল বারবনিতাদের চরিত্রের প্রধান লক্ষণ। দেশের কার্য্যে ব্রতী হইলেও আমাদের এই সকল দুষ্প্রবৃত্তিই আমাদিগকে পরিচালিত করিল। সুতরাং কথায় যে বলে "শিব গড়িতে বানর"—আমাদেরও হইল তাহাই।

যে সকল কর্ম্মী যুবকের চরিত্র-বল এমন ছিল যে একটা সিগারেট পর্য্যন্ত কখনও খায় নাই, তাহারা কেহ কেহ এই অসহযোগ

আন্দোলনের কর্ম্মক্ষেত্রে আমাদের সঙ্গে মিশিয়া মদ্য-পান পর্য্যন্ত শিখিয়াছে। যে সকল যুবক এমন পবিত্র চিত্ত ছিল যে স্ত্রীলোকের সহিত কথা কহিবার সময় মাথা তুলিত না—তাহারা আমাদের সংসর্গে আসিয়া এখন বেশ্যা দূরে থাক্, কুলবধূর সহিত নির্ল্লজ্জের মত কুৎসিত হাস্য পরিহাস করিতে অনেকে লজ্জিত হয় না। পতিতানারীদের একটী প্রধান স্বভাব এই যে তাহারা সচ্চরিত্র ও সংযত-চিত্ত পুরুষ দেখিলে তাহাকে হস্তগত করিতে বিশেষ চেষ্টা করে এবং তাহার সংযম ও পবিত্রতাকে বিনষ্ট করা একটা বীরত্বের কার্য্য বলিয়া মনে করে।

আমি জানি, আমরা যে কয়জন এই অসহযোগ আন্দোলনের কার্য্য করিতে গিয়াছিলাম, তাহার প্রত্যেকে অনেক দেশকর্ম্মী যুবক দিগকে প্রলুব্ধ করিয়াছিল। আমিও সেই অপরাধ হইতে মুক্ত নহি। এমন কি কেহ কেহ পিতৃতুল্য দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের পারিষদদিগের প্রতিও কটাক্ষ হানিতে ছাড়ে নাই। বাড়ীতে ফিরিয়া আমরা এই আলোচনাই করিতাম,—কে কয়টা নূতন ‘বাবু’ জুটাইয়াছে—কার ঘরে কোন দেশকর্ম্মী আসিলেন—পরের টাকায় কেমন পান সিগারেট খাওয়া হইল—মোটর চড়া গেল—ট্যাক্সী ভাড়ার টাকা হইতে কে কত টাকা আঁচলে বাঁধিয়াছে, ইত্যাদি।

আমার যে শুধু যুবকদের অধঃপাতে লইয়া গিয়াছি, তাহা নহে। গৃহস্থ ঘরের কন্যা ও বধূরাও আন্দোলনে যোগ দিয়া বাহিরে আসিয়াছিলেন। অবশ্য উহারা উদার, শিক্ষিত পরিবারেরই বৌঝি। সাধারণতঃ গোঁড়া হিন্দুরা তাঁহাদের অন্তঃপুরের স্ত্রীলোকদিগকে এ-ভাবে বাহিরে যাইতে দেন না। গৃহস্থ ঘরের যে সকল মহিলা

আমাদের সহিত কার্য্য করিতেন তাঁহাদের কাহারও সহিত নানা কথা প্রসঙ্গে আমাদের আলাপ হইত। আমি জানি, কয়েকটী ভদ্র গৃহস্থের বধু অসহযোগ আন্দোলন প্রচারের কার্য্য করিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা আর তাঁহাদের স্বামীর নিকট ফিরিয়া যান নাই। কেহ কোন কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন—কেহ বা কোন দেশকর্ম্মীর সহিত অবৈধ প্রণয়ে আসক্ত হইয়াছেন, কেহ কেহ স্বামী-স্ত্রী ভাবে বাস করিতেছেন। এই সকল দেশকর্ম্মীর আচরণ সকল লোকই জানে, অথচ তাহারা ভোট দিয়া এই প্রকার সাধু-বেশী লম্পট স্বভাব ব্যক্তিদিগকেই করর্পোরেশন, কাউন্সিলে প্রেরণ করে। সমাজের অন্ধতা এতদূর গভীর।

এই সম্পর্কে একটী কথা বলিতেছি। মফঃস্বলের এক ব্রাহ্মণ গৃহস্থ যুবকের স্ত্রী অসহযোগ আন্দোলনে মহিলা কর্ম্মীদের সহিত কার্য্য করিতে আসিয়াছিলেন, এই বধুটী পরমাসুন্দরী—আমি তাঁহাকে স্বচক্ষে দেখিয়াছি। তাঁহার সহিত আমার একদিন কথাবার্ত্তাও হইয়াছে। এই পুস্তকখানি যদি কখনও তাঁহার হাতে পরে, তবে তিনি হয়ত আমাকে চিনিতে পারিবেন। তাঁহার সহিত আমার অল্প পরিচয়েই একটু বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল। তাঁহার সম্পর্কিত ঘটনা এখানে প্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়াছি বলিয়া আমি তাঁহার নিকট ক্ষমা চাহিতেছি। তিনি যে অধঃপাতে গিয়াছেন, তার জন্য অংশতঃ কে দায়ী, তাহা আমি জানি।

আমার মনে আছে, আমি ব্রাহ্মণ কুলবধূটীর সহিত একটু অন্তরঙ্গভাবে নানাভাবের আলাপ করিয়াছিলাম। তিনি এক দেশকর্ম্মী কায়স্থ যুবকের সহিত অবৈধ প্রণয়ে আসক্ত হইয়া-

ছেন। এই যুবকটী উচ্চ শিক্ষিত আকুমার ব্রহ্মচারী ছিলেন। আমি প্রথমে একটু আশ্চর্য্য হইলাম। কারণ, আমার এমন সুন্দরী যুবতী বন্ধুটী যে শেষকালে একটা বাঙ্গাল যুবকের প্রেমে মজিবে তাহা ভাবি নাই। একবার এই ব্রাহ্মণ বধূটী অপর কতিপয় মহিলাকর্ম্মীর সহিত প্রচার কার্য্য করিবার নিমিত্ত পূর্ব্ববঙ্গে গিয়াছিলেন। এই ব্রাহ্মণ-বধূটী নারী-কর্ম্ম-মন্দিরের এক নির্জ্জন কক্ষে ঐ চির-কুমার কর্ম্মীর নিকট গীতা পড়িতেন।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মফঃস্বল হইতে যে সকল মহিলাকর্ম্মী আসিয়াছিলেন, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন কলিকাতায় তাঁহাদের থাকিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাহা হইতেই নারী-কর্ম্ম-মন্দিরের সৃষ্টি হয়। প্রথমে উহা ভবানীপুরে দেশবন্ধুর সাক্ষাৎ তত্ত্বাবধানে ছিল। তাঁহার অন্যতম সহকারী শ্রীযুক্ত বসন্ত কুমার মজুমদার মহাশয়ের পত্নী শ্রীযুক্তা হেমপ্রভা মজুমদার যখন কর্ম্মক্ষেত্রে বিশেষ দক্ষতা দেখাইলেন, তখন তাঁহার উপরেই নারী-কর্ম্ম-মন্দিরের ভার অর্পিত হয়, এবং উহা কলিকাতা সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটে স্থানান্তরিত হয়।

সেই ব্রাহ্মণ বধূটী স্বামী ছাড়িয়া আসিবার পর আর গৃহে যান নাই—কলিকাতাতেই থাকেন। নব প্রণয়ীর সহিত অবৈধ সংসর্গের ফলে তাঁহার গর্ভসঞ্চারের লক্ষণ দেখা যায়। তখন দেশ-কর্ম্মী যুবকটী সেই বধূটীকে লইয়া পলায়ন করিলেন। যাঁহারা এই অবৈধ প্রণয়ে বাধা দিয়াছিলেন, তাঁহারা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনকে এ বিষয়ে জানান। কারণ যুবকটী তাঁহার বিশেষ প্রিয় ছিল ; কিন্তু তিনি ইহার কোন প্রতিকার করিতে পারেন নাই।

কর্ম্মীদলের মধ্যে নারী পুরুষেয় এই প্রকার কলুষিত

সম্মিলনের অনেক ঘটনা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন জানিতেন। কিন্তু তিনি যখন দেখিলেন, আর কিছুতেই তাহা প্রতিরোধ করিতে পারিতেছেন না, নীতি-হীনতার জন্য চরিত্রবান কয়েকটি বিশিষ্ট কর্ম্মী চলিয়া গেলেন, তখন দুশ্চিন্তায় তাঁহার হৃদয় দমিয়া গেল—দেহ ভাঙ্গিয়া পড়িল—স্বাস্থ্য নষ্ট হইল। অর্থলোভী কর্ম্মীগণ তাঁহার নিকট হইতে অতিরিক্ত অর্থশোষণ করিতে লাগিল, তদুপরি এই দারুণ আঘাত পাইয়া তিনি আর মাথা তুলিতে পারেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর শবদেহ লইয়া যে বিরাট শোক যাত্রা হইয়াছিল তাহাতে যোগ দিবার জন্য আমাদের পল্লী হইতে পতিতাগণ গিয়াছিল। আমি যাই নাই। কোন বন্ধুর নিকট বলিয়াছিলাম, দেখুন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনকে আমরাই মেরেছি। তাঁর অকাল মৃত্যুর জন্য আমরাও দায়ী। দেশ সেবার ছল করে আমরা তাঁহার কর্ম্মীর দলের স্তরে স্তরে পাপের বিষ ছড়িয়ে দিয়েছি। জীবিত অবস্থায় এইভাবে তাঁকে আমরা আঘাত করেছি। আজ মৃত্যুর স্পর্শে যখন তিনি বিশুদ্ধ হ'য়ে স্বর্গে চলেছেন, তখন আর আমার মত পতিতার পাপ দৃষ্টি যেন তাঁহার পবিত্র মুখের উপরে না পরে।” এই ভাবিয়াই আমি দেশবন্ধুকে শেষ দেখা দেখি নাই।

এখন সেই ব্রাহ্মণ বধূটী তাহার প্রণয়ীর সঙ্গে স্বামী-স্ত্রী ভাবে বাস করিতেছেন। তাঁহাদের নাকি সন্তান জন্মিয়াছে। সমাজে তাঁহারা এক প্রকার নিঃসঙ্কোচে চলিতেছেন। ব্রহ্মচর্য্য ব্রতাবলম্বী উচ্চ শিক্ষিত (?) দেশকর্ম্মী যুবক এইরূপে পরদার গ্রহণ করিয়া সমাজে মর্য্যাদা লাভ করিয়াছেন—এখন রাজ-দরবারেও তাঁহার উচ্চ আসন। হায় সমাজ, পুরুষের বেলায় তুমি অন্ধ!

পিকেটিং করিবার সময় পুলিশ মহিলা কর্ম্মীদেরও গ্রেপ্তার করিত। একবার শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবী ও শ্রীযুক্তা বগলা সোম প্রভৃতিকে থানায় নিয়া সাবধান করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়। আমরা পুলিশকে ভয় করিতাম না। কারণ ঘাঁটির পাহারাওয়ালা হইতে পুলিশের উচ্চ কর্ম্মচারী পর্য্যন্ত সকলের সহিত আমাদের বিশেষ পরিচয় থাকে। আমাদের কয়েক জনকেও পুলিশ ধরিয়া থানায় নিয়াছিল। সেখানে প্রধান কর্ম্মচারী আমাকে দেখিয়াই একটু মুচ্‌কি হাসিলেন। দেখিলাম তিনি আমার পরিচিত। বিখ্যাত অভিনেত্রী নীরদা সুন্দরীর গৃহে তাঁহার সহিত আমার আলাপ হয়। কলিকাতার মধ্যে সকলেই এই ব্রাহ্মণ-বংশীয় পুলিশ কর্ম্মচারীকে ভালরূপ জানেন। বলা বাহুল্য তিনি আমাদিগকে মুক্ত করিয়া দিলেন।

ইহার কিছুদিন পরে উত্তর বঙ্গে ভীষণ জলপ্লাবন হয়। বন্যা-বিধ্বস্ত লোকদের সাহায্যের জন্য কলিকাতায় নানাপ্রকারে চাঁদা তোলা হইতে থাকে। ইহার জন্য এক কেন্দ্রীয় সমিতি গঠিত হয়। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান অধিনায়ক হইয়াছিলেন। ছাত্র ও যুবকেরা রাস্তায় রাস্তায় গান গাহিয়া ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিল—ধনী লোক স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া বহু অর্থ দান করিলেন—থিয়েটার,বায়স্কোপ কোম্পানীর মালিকেরা বেনিফিট নাইট্‌এর বন্দোবস্ত করিলেন ;—ছোট ছোট ক্লাব ও নানাপ্রকার সমিতি অভিনয়াদি আমোদ-প্রমোদের দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিলেন, গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতেও সাহায্যের জন্য সামান্য টাকা মঞ্জুর হইল।

অসহযোগ আন্দলনের সময় প্রকাশ্য কর্ম্ম ক্ষেত্রে নামিয়া

আমাদের সাহস বাড়িয়াছিল। সুতরাং এই ব্যপারেও আমরা উদাসীন রহিলাম না। আমাদের দল পূর্ব্ব হইতেই এক প্রকার গঠিত ছিল। তবে এবার উহাকে আরও বড় করিতে হইল। আমরা প্রস্তাব করিলাম, নিজেদের মধ্যে চাঁদা না তুলিয়া দল বাঁধিয়া গান গাহিয়া রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষা করিতে হইবে। তদনুসারে হাড়কাটা গলি, রামবাগান, সোনাগাছি, ফুলবাগান, চাঁপাতলা, আহিরীটোলা, জোড়াসাঁকো, সিমলা, কেরাণীবাগান প্রভৃতি বিভিন্ন পল্লীর পতিতাগণ পৃথক পৃথক দল গঠন করিয়া রাস্তায় ভিক্ষা করিতে বাহির হইল।

সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! কলিকাতায় অধিবাসীগণ স্তম্ভিত হইয়া গেল। এক এক দলে প্রায় ৫০।৬০ জন পতিতা নারী—তাহাদের পরিধানে গেরুয়া রংয়ের লালপাড় সাড়ী—এলো চুল পিঠের উপর ছড়ান—কপালে সিঁদুরের ফোঁটা—কণ্ঠে মধুর সঙ্গীত—মনোহর চলনভঙ্গী, সঙ্গে করেকজন পুরুষ ক্লেরিয়নেট ও হারমনিয়ম বাজাইতেছে। অগ্রে অগ্রে দুইটি নারী একখানি শালুর নিশান ধরিয়া যায়, তাহাতে কোন্ পাড়ার পতিতা নারী সমিতি, তাহা লিখিত আছে। তাহার পশ্চাতে অপর দুই নারী একখানি কাপড় ধরিয়াছে, তাহাতে দাতাগণ টাকা, পয়সা নোট প্রভৃতি ফেলিয়া দিতেছে। আর দুইজন স্ত্রীলোক পুরাতন বস্ত্র সংগ্রহ করিতেছে।

বেশ্যাদের মধ্যে অনেকেই যে খুব সুন্দরী তাহা নহে, তবে তাহারা সকলেই নিতান্ত কুৎসিৎ একথাও সত্য নয়। যাহা হউক, সাজিয়া বাহির হইলে পতিতা নারীদের সকলকেই সুন্দরী দেখায়। কারণ, ইহার উপরেই তাহাদের ব্যবসার ভিত্তি। রূপ দেখাইয়া

জন-সাধারণকে প্রলুব্ধ করিবার জন্য কলিকাতার রাজপথে বেশ্যাদের দাঁড়াইবার নিয়ম নাই। তাহা হইলে তাহাদিগকে পুলিশে বাঁধিয়া নেয়। প্রলুব্ধ করিবার জন্য তাহারা তাহাদের দরজার চৌকাঠের বাহিরে আসিতে পারে না। সুতরাং, খাঁটি বেশ্যা পল্লীতেও তিন চারিটী স্ত্রীলোককে কদাচ রাস্তার উপরে এক সঙ্গে দেখা যায়। এমন অবস্থায় যদি বেশ্যারা দল বাঁধিয়া গান গাহিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া চলিতে থাকে, তবে তাহা সাধারণ লোকের চক্ষে কেমন লাগে তাহা একবার ভাবিয়া দেখুন।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নিত্য অসংযম ও ভোগ লালসার মধ্যে থাকাতে পতিতা নারীদের চরিত্রে কুভাবই প্রবল থাকে। অসহ-যোগ আন্দোলনে দেশপ্রীতির ভাব, অথবা বন্যা-পীড়িতের সাহায্যে ভিক্ষা করার কার্য্যে দয়ার ভাব পতিতা নারীদের চিত্তকে বিশেষ অধিকার করে নাই। আমরা নিজেদের লোকের সম্মুখে জাহির করিবার একটা সুযোগ পাইয়া তাহার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়াছি, এইমাত্র। সকলে না হউক অন্ততঃ অনেকে।

আমরা যখন ভিক্ষা করিতে বাহির হইতাম তখন শত শত লোক আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিত।

বন্যা-পীড়িত দুর্দ্দশা-গ্রস্থ নরনারীর দুঃখে কাতর হইয়া সকলেই আমাদের তহবিলে টাকা দিত না ; আমাদের রূপ দেখিয়া, আমাদের গান শুনিয়া, আমাদের কটাক্ষ খাইয়া, তাহারা মুগ্ধ হইয়া টাকা দিয়া যাইত। ছাত্র ও যুবকের দলে এত লোকের ভিড় হইত না।

সকালে ও সন্ধ্যায় দুই বেলাই পতিতা নারীর দল অর্থ সংগ্রহ করিতে বাহির হইত। আমরা বহু সহস্র টাকা পাইয়াছিলাম, কিন্তু

নানা অপব্যয় করিবার পর তাহার অংশ বিশেষ মাত্র কেন্দ্রীয় সমিতির তরবিলে পৌঁছিয়াছে। আমরা যাহা কিছু দিয়াছি, আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় তাহাই সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন। আমাদের টাকা লইতে সুনীতিবাদী ব্যক্তিদের আপত্তি ছিল; কিন্তু আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া মত করিলেন।

ক্রমশঃ আমরা ভদ্র গৃহস্থ পরিবারের যুবক ও কুলবধুদের সহিত মেলামেশা করিবার অধিক সুযোগ পাইতে লাগিলাম। অবশ্য পূর্ব্বে যে তাহা ছিলনা এমন নয়। দ্বাদশ গোপাল, তারকেশ্বর, কালীঘাট প্রভৃতি তীর্থস্থানে ও মেলায় আমাদের অবাধ গতিবিধি ছিল, এখনও আছে। তাহাতে ও সমজের কিছু অবনতি ঘটিতেছে। তবে সে সকল স্থলে প্রত্যেকেই নিজ নিজ ধর্ম্মানুষ্ঠানে ব্যস্ত থাকে—পতিতা নারীদের সহিত অলাপ পরিচয় করিবায় বিশেষ প্রলোভন অথবা অবসর কাহারও ঘটেনা। কিন্তু এবার অসোহযোগ আন্দোলন উপলক্ষ্য করিয়া আমরা যে ভাবে বাহির হইলাম, তাহাতে ভদ্র পুরুষ ও মহিলাদের সহিত আমাদের কথাবার্ত্তা প্রয়োজন বশতঃ অনিবার্য্যই ছিল। মেলায় অথবা তীর্থস্থলে জনতার মধ্যে পতিতা নারীগণ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকে, তাহারা সাধারণের চক্ষে অমন জাজ্জ্বল্যমান হয়না। কিন্তু আমরা ভিক্ষার ছলে অথবা পিকেটিং করিবার জন্য যেমন দলবদ্ধ হইয়া বাহির হইতাম, তাহাতে সর্ব্বসাধারণের মুগ্ধদৃষ্টি আমাদের প্রতি আকৃস্ট না হইয়া যাইত না।

মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের অন্তর্গত আরও কয়েকটি প্রধান বিষয় ছিল,—অস্পৃশ্যতা দূর, চরকা ও খদ্দর। আমাদের পতিতা নারীসমাজে ইহার ফল কিরূপ হইয়াছিল, তাহা সংক্ষেপে

বলিতেছি। অস্পৃশ্যতা দূর বলিতে মহাত্মা গান্ধী বোধ হয় এই বুঝিয়াছিলেন যে, হাড়ী, মুচি, ডোম, চণ্ডাল, পারিয়া, দুলে বাগ্দী, সাঁওতাল, দোসাদ প্রভৃতি নিম্ন শ্রেণীর লোক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিলে তাহাদের পরিবেশিত অন্নজল উচ্চ বর্ণের লোক গ্রহণ করিতে পারিবেন, এবং এই সকল অন্ত্যজ জাতির লোক শুদ্ধদেহে ও পবিত্র পরিচ্ছদে দেব-মন্দিরে প্রবেশ করিতে পারিবে। কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর কোন কোন ভক্ত বেশ্যাদিগকেও অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত মনে করিয়া তাহাদিগকে ভদ্রসমাজে 'চল' করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। একথা বোধ হয় সকলেই জানেন, পতিতার গৃহে যে সকল ভদ্রলোক গমন করেন, তাঁহারা গোপনে সেই নারীর স্পৃষ্ট সর্ব্বপ্রকার খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করেন—শুধু গ্রহণ করেন বলিলে কথাটা অসম্পূর্ণ থাকে—গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হন। যে কার্য্যটী গোপনে হইয়া থাকে, তাহা প্রকাশ্যে করাই এই গান্ধী-ভক্তদের উদ্দেশ্য ছিল। দেবমন্দিরে প্রবেশ বেশ্যাদের পক্ষে কখনও নিষিদ্ধ হয় নাই। তাহাদের সাজ পোষাক দেখিয়া পুরোহিত ঠাকুরের চমক লাগিয়া যায়—প্রচুর দক্ষিণার লোভে, তিনি—না বলিতেই দ্বার উন্মুক্ত করিতে আদেশ দেন।

পতিতাদের প্রতি এই অপূর্ব্ব সহানুভূতির ফলে নানাস্থানে পতিতা নারীসঙ্ঘ স্থাপিত হইল। তন্মধ্যে বরিশালের বেশ্যা-সমিতিই অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। সেই সময়ে আমার বন্ধু কালীদাসীর বাড়ীতে বরিশাল হইতে একটী বারবণিতা আসে। তাহার নাম এখন ঠিক মনে হইতেছে না, বোধ হয় বসন্তকুমারী হইবে। যাহা হউক, এই বসন্তকুমারীকে লইয়া এক তরুণ ছাত্র-যুবক

কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যুবকটী কোন ধনী ব্যবসায়ীর পুত্র। বাপের লোহার সিন্দুক ভাঙ্গিয়া আটশত কাটা লইয়া পতিতা-প্রণয়িণীকে কলিকাতায় আনিলেন। বসন্তকুমারীর মুখে শুনিলাম, বরিশালের এক বিখ্যাত দেশকর্ম্মী দার্শনিক ব্যক্তি তরুণ যুবকদের দ্বারা পতিতালয়ে অসহযোগ মন্ত্র প্রচার করিতেছেন। তথাকার বারবণিতাগণ চরকায় সূতা কাটিতেছে ও খদ্দর পরিধান আরম্ভ করিয়াছে। আমি এত উৎসাহিত হইলাম যে আমিও একটা চরকা কিনিয়া ফেলিলাম—খদ্দরের শাড়ী ব্লাউজ পড়িতে লাগিলাম।

আমার চেষ্টায় রামবাগানে দশ বার জন পতিতা নারী চরকায় সূতা কাটিতে লাগিল। কেহ কেহ খদ্দর পড়িতে আরম্ভ করিল। কিন্তু দুই মাসের মধ্যে সব শেষ। চরকা খদ্দর বন্ধ হইয়া গেল। তা' হইবার কথা—কারণ সংযম ও পবিত্রতার ভিত্তি ব্যতীত উহা দাঁড়াইতে পারে না।

একদিন দেখিলাম কোন খবরের কাগজে লেখা হইয়াছে—"কি দুঃখের বিষয়—'অশ্বিনীকুমারের বরিশালে আজ যুবকেরা পতিতার সংস্পর্শে যাইতে কিছুমাত্র লজ্জিত হয় না।" আমি বসন্তকুমারীকে জিজ্ঞাসা করিলাম "ভাই, তোমাদের বরিশালে অশ্বিনীকুমার কে? বসন্ত বলিল "আমি তিন মাস পূর্ব্বে ত্রিপুরা জেলার ব্রাহ্মণবাড়িয়া হইতে বরিশালে আসি। অশ্বিনীকুমারের পরিচয় আমি জানিনা—উনি বোধ হয় জানিতে পারেন।" বসন্ত তাহার বাবুকে লক্ষ্য করিয়া বলিল। যুবকটী পার্শ্ববর্ত্তী পালঙ্কের উপর শুইয়া পান চিবাইতে চিবাইতে বিকৃতস্বরে গাহিতেছিলেন—

"এখনও তারে চোখে দেখিনি,
শুধু বঁশী শুনেছি।
মন প্রাণ যা' ছিল তা' দিয়ে ফেলেছি"।—

বসন্তের কথায় আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "অশ্বিনী বাবুর নাম শুনেন নি!—স্বনামধন্য পুরুষ অশ্বিনীকুমার দত্ত। আপনি এত পড়াশুনা করেছেন—তাঁর ভক্তিযোগ পড়েন নি?—একবার পড়ে' দেখ্‌বেন। পবিত্র চরিত্রের এমন উচ্চ আদর্শ আর কোথাও নাই! অশ্বিনী বাবুর হাতে গড়া বরিশাল।" আমি বলিলাম "সেই অশ্বিনী কুমার দত্ত! হাঁ, তাঁর নাম আমি জানি।"

আমি তাঁর মুখের উপর জবাব দিলাম "আপনিও সেই বরিশালেরই যুবক—না? যুবকটী নির্লজ্জের মত পুনরায় গাহিতে লাগিল—

"শুধু স্বপনে এসেছিল যে,
নয়ন কোনে হেসেছিল সে"—

আমি বিরক্ত হইয়া উঠিয়া আসিলাম। আমার মনে হইল, মানুষ এত বড় ভণ্ড হইতে পারে—একটা মহান আদর্শকে প্রশংসা কর্‌বার সঙ্গে সঙ্গে নিজের কার্য্য দ্বারা অম্লান বদনে তাহাকে পদদলিত করিয়া যায়। যাহা হউক, বসন্তের প্রণয়ী এই যুবকটী আমাকে একদিন অশ্বিনী বাবুর 'ভক্তিযোগ' পুস্তকখানি আনিয়া দিলেন। বলিলেন, ইহা আমার উপহারস্বরূপ গ্রহণ করুণ।" সেই অবধি আমি ভক্তিযোগ মাঝে মাঝে পাঠ করিতাম।

এই পতিতা-নারী-সমিতির প্রভাব ক্রমশঃ এতদূর বিস্তৃত হইল যে একদল সুনীতি-জ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তি ইহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। সঞ্জীবনী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রথমাবধি

ইহার বিরুদ্ধে ছিলেন। ঐ সংবাদ পত্রে তিনি চিরদিন এই সম্পর্কে কঠোর মন্তব্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। হিমাচলের মত দৃঢ় চিত্ত এই মহাপুরুষকে আমি জীবনে কয়েকবার মাত্র দেখিয়াছি ; তাহাতে তাঁহাকে দেবতা সদৃশ বলিয়া আমার মনে হইয়াছে—তাঁহার কথা আমি আর ও দুইটী পতিতা নারীর মুখে শুনিয়াছি—তাহাদের নাম সুরুচি ও ঊষাবালা। যথাস্থানে ইহাদের কথা বলা হইবে।

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের সম্বন্ধে 'এখানে আরও দুই একটী কথা না বলিয়া পারিলাম না। তাঁহার সুনীতি ও পবিত্রতার আদর্শের তুলনায় আমরা অতি হীন—নরকের কীটানুকীট। তথাপি তাঁহার কথা এই জন্য বলিতেছি, তাহাতে আমার চরিত্র আরও পরিস্ফুট হইবে। কৃষ্ণবাবু দুর্নীতিকে কখনও কোন মিথ্যা অজুহাতে ক্ষমা করেন নাই—কাহাকেও ছাড়িয়া কথা কহেন নাই। রবীন্দ্রনাথ থিয়েটারের অভিনেত্রীদের গান শিখাইতে যান বলিয়া তাঁহাকে তিরস্কার করিয়াছেন—আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র পতিতার দান গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার উপরও দোষারোপ করিয়াছেন—ডাক্তার বিমল চন্দ্র ঘোষ 'সরযূ সদনের' সাহায্যার্থ বেশ্যার দ্বারা নাট্যাভিনয় করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার অজস্র নিন্দাবাদ করিয়াছেন—শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ম্ময়ী গাঙ্গুলী মিনার্ভা থিয়েটারে বেশ্যাদের সভায় মহিলা ভলান্টিয়ারদের নেত্রী হইয়াছিলেন বলিয়া তৎসম্বন্ধে তীব্র মন্তব্য করিয়াছেন। ইঁহারা সকলেই ব্রাহ্ম সমাজের এক এক জন বিশিষ্ট ব্যক্তি। আমার সকল প্রণয়ীই ইঁহাকে ভয় করিত।

২। মহাত্মা গান্ধী যখন বঙ্গদেশ পরিভ্রমণ করেন, তখন তিনি বরিশালে গমন করিলে সেখানকার পতিতা-নারী-সমিতি তাঁহাকে

নিমন্ত্রণ করে। কিন্তু মাহাত্মা গান্ধী সেই সমিতিতে যান নাই; তিনি বলেন "পতিতারা যদি একত্র মিলিত হইয়া সমিতি গঠন করে তবে দেশের চোর ডাকাতরাও সমিতি গঠন করিবে।" সেই দার্শনিক দেশকর্ম্মী মহাশয় মহাত্মাজীর তিরস্কার লাভ করিয়া এক্ষণে বরিশালের কর্ম্ম ক্ষেত্র হইতে নাকি চলিয়া গিয়াছেন।

আমার জীবনেও এদিকে দুর্য্যোগ ঘনাইয়া আসিতেছিল। রাজনৈতিক আন্দোলনে বাহির হইয়া দেশকর্ম্মী যুবকদের মধ্যে বিচরণ করিবার সময় আমি আত্ম-সংযম করিতে পারি নাই। আমার কায়িক ও মানসিক অপরাধ হইয়াছে। যেখানে শিক্ষার অভাব—যেখানে শাসন নাই—যেখানে অহঙ্কারই প্রবল, সেখানে এরূপ ত হবেই। আমার সেই ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারী—পাধ্যায় বাবুটী আমার বে-চাল লক্ষ্য করিয়াছেন—আমার আচরণ সন্দেহের চক্ষে দেখিয়াছেন।

এদিকে তিনিও অপরাধী হইয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে থিয়েটারে একটু বেশী যাওয়া-আসা করিতে দেখিলাম। একদিন থিয়েটারে গ্রীন্ রুম্ বা সাজ ঘরে কোন অভিনেত্রীর সহিত তাঁহার হাস্য পরিহাসের সময় আমার দৃষ্টি সেই দিকে পরিল। আমরা দু'জনেই থিয়েটার দেখিতে গিয়াছিলাম। আমাকে বক্সে রাখিয়া তিনি ছল করিয়া বাহিরে গিয়াছিলেন; গোপনে আমিও গিয়াছিলাম।

আমাদের দু'জনেরই হৃদয় বর্ষার বিদ্যুৎপূর্ণ দুইখানি মেঘের মত পরস্পর নিকটে আসিতেছিল। আশঙ্কা করিতেছিলাম, একদিন দিগ্ দিগন্ত কম্পিত করিয়া দারুণ বজ্রপাত হইবে।

নবম

পঙ্কিল আবর্ত্তে

মদ্যপান বন্ধ করা মহাত্মা গান্ধির আন্দোলনের আর একটি কার্য্য ছিল। তদনুসারে যুবকের দল স্থানে স্থানে মদের দোকানে পিকেটিং করিতে আরম্ভ করে। আমাদের চাকর একদিন বাবুর বন্ধুদের জন্য মদ আনিতে যাইয়া বাধা পায়। যুবকেরা তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিল। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল "কার জন্য মদ কিনেছিস্ ?" আমাদের চাকর আমার বাড়ীর নম্বর বলিল। তাহারা নাম জানিতে চাহিল। চাকর বলিল "ফিরোজা বিবির ঘর।" আমি ফিরোজা রংয়ের জামা কাপড় পরিতে ভালবাসিতাম বলিয়া রামবাগানে আমার ডাকনাম ছিল ফিরোজা বিবি। চাকরটী তখন কোন প্রকারে ছাড়ান পাইয়া আসিল।

পরদিন দুপুর বেলার খাওয়ার পর একটু বিশ্রাম করিতেছি, এমন সময় চাকর আসিয়া জানাইল, একজন ভদ্রলোক দেখা করিতে চাহেন। আমি তাঁহাকে ঘরে আনিতে বলিয়া বিছানা হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলাম। দেওয়ালের গায়ে ঝুলান বৃহৎ আয়নার সম্মুখে যাইয়া চুল ও পরণের কাপড় ঠিক করিতে ছিলাম। অকস্মাৎ একি—আয়নার মধ্যে কাহার প্রতিবিম্ব পরিল ?—আমি চমকিত হইয়া দরজার দিকে ফিরিয়া দেখি নন্দ দাদার এক বন্ধু।

তাঁহার পরিধানে খদ্দরের ধূতি—গায়ে খদ্দরের এক চাদর—পায়ে মদ্রাজী স্যাণ্ডেল, হাতে একটা মোটা লাঠি। মাথার চুল ছোট ছোট করিয়া ছাঁটা। আমি কিছুমাত্র বিস্ময়ের ভাব না

দেখাইয়া স্পষ্টস্বরে একটু তিরিক্ষি মেজাজে বলিলাম "আপনি কে?—এ সময়ে আপনার কি প্রয়োজন?" কিন্তু আমার বুক কাঁপিতেছিল।

নন্দ দাদার বন্ধু আমার আপাদ-মস্তক একবার দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, মানী তুমি এখানে?" আমি বলিলাম, আমার নাম ফিরোজা বিবি,—।" নন্দ দাদার বন্ধু ভিতরে আসিয়া বিছানায় বসিয়া লাঠিটা সম্মুখে শোয়াইয়া রাখিল। আমি দাঁড়াইয়া ছিলাম। নন্দ দাদার বন্ধু আমার ডান হাত ধরিয়া বলিল "বস না এই খানে!" আমি যন্ত্র চালিতের মত বসিয়া পড়িলাম। মাথা নীচু করিয়া বিছানার চাদর খুঁটিতে লাগিলাম। নন্দদার বন্ধুর নাম উপেন্দ্র।

নন্দ দাদার বন্ধু আমাকে বলিল "মানী, তুমি শেষে এই করিলে?—পড়া শুনার এই পরিণাম?" আমি নন্দদার বন্ধুর পায়ে পড়িয়া কাঁদিয়া ফেলিলাম। সে বলিল, "কাল রাত্রিতে মদের দোকানে পিকেটীং করতে এসে তোমার চাকরের মুখে ফিরোজা বিবির ঠিকানা পেয়েছি। আমরা মহাত্মা গান্ধীর মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে মদ্যপান রহিত করতে প্রতিজ্ঞা করেছি। বেশ্যাদের ঘরেও আমরা এই জন্যে যাই। আজ ফিরোজা বিবির ঘরে আসবার কাজ আমার উপর পরেছিল। এখানে এসে দেখলাম সে আমারি পরিচিত মানদা। তা হলে আজ থেকে তোমার ঘরে মদ আসা বন্ধ,—মনে রেখো!'

উপেন বাবুর নিকট বাড়ীর সমস্ত সংবাদ জানিলাম। বাবা মনোদুঃখে কলিকাতার সমস্ত বাড়ী বিক্রয় করিয়া পল্লী গ্রামে যাইয়া বাস করিতেছেন। আমর মামার (নন্দদার পিতার) মৃত্যু হইয়াছে। নন্দ দাদা গান্ধীর আন্দোলনে মজিয়াছে। মুকুলদা বি এল্ পাশ

করিয়া......কোর্টে প্র্যাক্‌টিশ করিতেছেন। তাঁহার সাহিত্য'চর্চ্চার দিকে বেশী মন থাকায় অর্থোপার্জ্জন কিছুই হয় না। কমলা ম্যাট্রীক পাশ করিয়া ডাক্তারী পড়িবার জন্য পশ্চিমে কোথায় গিয়াছে। তাহার মাতা কলিকাতার বাড়ী ছাড়িয়া এখন কমলার সহিতই সেখানে থাকেন। নন্দ দাদা তখন ও বিবাহ করেন নাই।

আমি তাহাকে মাঝে মাঝে আসিতে অনুরোধ করিলাম। উপেন বাবু বলিলেন "তোমার কাছে যে উদ্দেশ্যে আসা, তা'ত হয়ে গেল। আর মদ কিন্‌বেনা, বাস, আর ত কোন প্রয়োজন নাই।" উপেন বাবু বিছানা হইতে উঠিলেন। আমি তাহাকে কিছু খাইবার জন্য কত মিনতি করিলাম কিন্তু তিনি কিছু খাইলেন না—একটা পান পর্য্যন্ত না। এমন চরিত্রবান যুবক কর্ম্মী ও আমাদের সংস্পর্শে আসিয়াছেন, যাঁহারা পাপীর সংস্পর্শে আসিয়াও পাপ হইতে দূরে থাকিতে সমর্থ হইয়াছেন।

আমার ঘরে আর মদ আসিত না। বাবুর বন্ধুগণ অসন্তুষ্ট হইলেন—বাবুও রাগ করিলেন। উপেন বাবুর কাছে আমি চিঠিপত্র লিখিতাম—সে তাহার সংক্ষিপ্ত উত্তর দিত। আমার বাবু ইহা সন্দেহের চক্ষে দেখিতেন। সুতরাং আমাদের মধ্যে মনোমালিন্য দিন দিন বাড়িয়া উঠিল।

নন্দদাদার এই বন্ধুটী আমার পরিচিত। বাল্যকালে তাঁহাকে আমাদের বাড়ীতে অনেকবার দেখিয়াছি। তিনি নন্দদাদার প্রতিবেশী এবং দূর সম্পর্কিত আত্মীয়। নন্দদাদাকে আসিবার জন্য অনেকবার বলিয়া দিয়াছি, কিন্তু তিনি আমার এই পরিণাম শুনিয়া আর আমার নিকট আসেন নাই।

দুই তিন মাসের মধ্যেই আমার এই পাধ্যায় বাবু আমাকে ছাড়িয়া দিলেন। যে অভিনেত্রীর সহিত তাঁহাকে হাস্য পরিহাস করিতে দেখি-

য়াছিলাম, তাহারই ঘরে তিনি যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিলেন। এখন ব্যাঙ্কের টাকায়ই নটীর পূজা আরম্ভ হইল। অপব্যয়ের ফলে কয়েক বৎসরের মধ্যেই ব্যাঙ্ক ফেল্ হইল। তিনি নিজেও গেলেন, দেশের লোকেরও সর্ব্বনাশ। অনেক ব্যবসা, শিল্প প্রতিষ্ঠান এই-ভাবে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। অনেকের আজীবন সঞ্চিত ধন, ব্যাঙ্ক ফেল হওয়ায়, তাঁহারা ভিখারী সাজিয়াছেন। আপনারা মূল কারণ অনু-সন্ধান করিলে তাহা জানিতে পারিবেন। কোনও পুরাতন বিখ্যাত মাসিক পত্রিকাও তাহার ম্যানেজারের বেশ্যাশক্তির ফলে বিলুপ্ত হইয়াছে।

আমি মনে করিলাম আর কাহারও নিকট বাঁধা থাকিবনা। ভাল গায়িকা বলিয়া আমার সুনাম ছিল—আমি সোনাগাছিতে উঠিয়া গেলাম। এইখানে রাজসাহী জেলার কোন জমিদার যুবক আমার গৃহে আসিতেন। তিনি অতিশয় মদ্যপায়ী ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে প্রায়ই থিয়েটারে যাইতাম। একদিন বক্সে বসিয়া আছি—জমিদার বাবুটি অতিরিক্ত মদ্যপানে একটু মাতলামি আরম্ভ করিয়াছেন। আমরা জানিতাম না—বাবুর শাশুড়াটি নিকটবর্ত্তী আর এক বক্সে বসিয়াছিলেন। তিনি নাকি পূর্ব্ববঙ্গের কোন বিশিষ্ট জমিদার গৃহিণী। জামাতার এইরূপ লজ্জাজনক আচরণ দেখিয়া তিনি আমাদের নিকট হইতে জামাতাকে তখনি নিজগৃহে লইয়া গেলেন। এখন সেই জমিদার বাবুটী সত্যবালা নাম্নী আমার পরিচিতা এক পতিতার ঘরে যান। সমাজে তাঁর মান মর্য্যাদা যথেষ্ট।

আমি মাঝে মাঝে বড়লোকের বাগান অথবা মজলিসে গানের মুজ্‌রায় যাইতাম। ইহাতে অর্থোপার্জ্জন হইত বটে, কিন্তু বিপদও ছিল। বড়লোকের খেয়াল মাফিক চলা যে কি বিরক্তিজনক, তাহা

বুঝাইবার সাধ্য আমার নাই। সারারাত্রি জাগরণ, ভালবাসার ভাণ, মাতলামির ঝঞ্ঝাট—এই সব করিতে শরীর মন একবারে অবসন্ন হইয়া পড়িত। ভাবিতাম—আর না, সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া ফেলি। হৃদয়ে দারুণ অনুতাপ উপস্থিত হইত। কিন্তু প্রলোভন কখনও জয় করিতে পারি নাই—বার বার ঘূর্ণিপাকে পরিয়াছি।

১৯২৪ সালের বর্ষাকালে তারকেশ্বরের সত্যাগ্রহ আরম্ভ হয়। বর্ত্তমান মোহান্ত সতীশ গিরির বিরুদ্ধে পূর্ব্বাবধি নানাবিধ অত্যাচারের অভিযোগ ছিল। তদনুসারে দেবোত্তর সম্পত্তির তত্ত্বাবধানের জন্য গভর্ণমেণ্ট রিসিবার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু স্বামী সচ্চিদানন্দ ও বিশ্বানন্দের নেতৃত্বে মহাবীরদল রিসিবারের মন্দির-প্রবেশ বাধা দেন। এদিকে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বে কংগ্রেসীদল প্রবেশাধিকার দাবী করেন। তাঁহারা বলেন মোহান্তের কোন ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকিতে পারে না। এই প্রাসাদের মধ্যে যে মূর্ত্তি আছে, তাহা দর্শন ও পূজা করিবার অধিকার জনসাধারণের আছে। এই গোলযোগের মধ্যে মহাবীরদল, গভর্ণমেণ্ট, মোহান্ত, কংগ্রেস সকলে জড়াইয়া পড়িল। মারামারি লুটপাট প্রভৃতি তুমুল কাণ্ড চলিতে লাগিল।

কলিকাতা হইতে আমরা প্রায় দশ বার জন পতিতা নারী তারকেশ্বরে যাত্রা করি। সেখানে যাইয়া দেখিলাম হুগলী, শ্রীরামপুর, নোনাডাঙ্গা, সেওড়াফুলি প্রভৃতি স্থান হইতে আরও বেশ্যা আসিয়াছে। আমরা সকলে মিলিয়া মহিলা-ভলাণ্টিয়ার দল গঠন করিলাম। সত্যাগ্রহ পরিচালনা করিবার জন্য আমরা কিছু টাকা চাঁদাও তুলিয়াছিলাম।

মোহান্তের প্রাসাদের সম্মুখে সত্যাগ্রহ করিতে কংগ্রেসীদল আমাদিগকে দিলনা। মন্দির রক্ষা করাই আমাদের প্রধান কার্য্য হইল। স্বামী সচ্চিদানন্দকে পুলিশ গ্রেপ্তার করিতে আসিলে আমরা তাঁহার চারিদিকে ঘেরিয়া বসিলাম। পুলিশ বিফল মনোরথ হইয়া চলিয়া গেল। আমরা পালা করিয়া মন্দিরের দ্বারে প্রহরীর কার্য্য করিতে লাগিলাম।

ডাক্তার প্রতাপ চন্দ্র গুহরায় ও শ্রীযুক্তা সন্তোষ কুমারী গুপ্তা ইঁহারাই তারকেশ্বরে সত্যাগ্রহের প্রধান পরিচালক ছিলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন একদিন যাইয়া আমাদের সকলকে উৎসাহিত করিয়া আসেন। আমাদের সুখ ও স্বচ্ছন্দতার জন্য প্রচুর অর্থব্যয় হইয়াছে। সত্যাগ্রহ তহবিলে বহু সহস্র টাকা চাঁদা উঠিয়াছিল। যথাসময়ে তারকেশ্বর সমস্যার এক প্রকার মীমাংসা হয়। কিন্তু সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সময় সেখানে যে বীভৎস ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহা আজও ভুলিতে পারি নাই। মহিলা ভলান্টিয়ার নামধারী বেশ্যাদের সহিত বিভিন্ন দলের ভলান্টিয়ার নামধারী অনেক ভণ্ড লম্পটের অবাধ কলুষিত সংযোগ—যাঁহারা দেশকর্ম্মী বলিয়া পরিচিত তাঁহাদের কাহারও রাত্রিযাপন সমস্যা—আমার নিকট কোন সত্যাগ্রহী ব্যক্তির প্রস্তাব—এই সব দেখিয়া মনে হইয়াছে, তারকেশ্বরে ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হয় নাই—তথায় পুণ্যের আলোক নিভিয়া গিয়াছে।

সেখানে দেব-দর্শনার্থী সুকৃতি নাম্নী এক যুবতীর সহিত আমার পরিচয় হয়। সাবিত্রী নামে সুকৃতির এক ভগ্নী ছিল। ইহারা কলিকাতা জোড়াসাঁকো পল্লীর বিখ্যাত উচ্চ বংশের কন্যা। লোকে বলে এই বংশে লক্ষ্মী সরস্বতীর বিবাদ নাই। সুকৃতি ও সাবিত্রী

উভয়েই পতিতাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া শোভাবাজারে বাস করে। গভর্ণমেণ্টের একজন উকীল সুকৃতির ঘরে যাতায়াত করিয়া থাকেন। কিছুকাল পূর্ব্বে সাবিত্রীর মৃত্যু হইয়াছে। একজন বড় দেশকর্ম্মী তাহার কাছে যাইত। যে সকল পরিবার বাংলার গৌরব, তাহাদেরও আজ এ কি অধঃপতন! ইহার নিকট বাংলার বহু বিখ্যাত ব্যক্তির যে ইতিহাস শুনিয়াছি, তাহা লিখিলে হয়ত আইনের দায়ে পড়িতে হবে—এজন্য লিখিলাম না। এই পরিবারই অবাধ মেলামেশার পথ প্রদর্শক।

উপেন বাবুর নিকট শুনিয়াছি, নন্দদার সংযম অটুট রহিয়াছে। কোন নারী তাহার সম্মুখে প্রলোভন লইয়া আসিতে পারে নাই। অসহযোগ আন্দোলনের ভাল দিক্‌টা তাহার পূর্ব্ব গঠিত চরিত্রকে আরও সুদৃঢ় করিয়া তুলিয়াছে। বিলাস শূন্যতা ও সৎকার্য্যে আসক্তি এই দুইটী তাহার ব্রহ্মচর্য্যের প্রধান সহায়। আমার মত সাহিত্য চর্চ্চা না করা নন্দদার পক্ষে মঙ্গলজনক হইয়াছে। দারিদ্র্য তাহার বন্ধুর কার্য্য করিয়াছে। এমন নির্ম্মল চরিত্রের কর্ম্মীও আছে, কিন্তু তাহাদের সংখ্যা অল্প।

আমার সম্বন্ধে নন্দদাদা নাকি এই কথা বলিত "মানদা যদি তা'র পাপজীবনের সমস্ত ঐশ্বর্য্য ছেড়ে এক বস্ত্রে আমার কাছে আসে, আমি তা'কে আদরের সহিত মাথার মণি ক'রে রাখ্‌ব—বোন্ ব'লে তেমনি স্নেহ ক'র্‌ব। কিন্তু সে পতিতা-পল্লীতে—পতিতাবৃত্তিতে থাকিলে আমি তাহার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রাখ্‌তে পারি না।"

আমি কখনও সিগারেট অথবা মদ খাই নাই। পতিতা নারীদের এই অভ্যাস অর্থোপার্জ্জনের অনুকূল নহে। আমার বাবুগুলি আমাকে এই নেশা দুইটী ধরাইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু

কেহই সফলকাম হন নাই। উপেন বাবু মদ্যপান নিবারণের জন্য বেশ্যাদের গৃহে পিকেটিং অনেকদিন চালাইয়াছেন। আমি যথাসাধ্য তাঁহার সাহায্য করিয়াছি।

পূজার ছুটী, বড়দিনের অবকাশ প্রভৃতি উপলক্ষে মফঃস্বলের উকীল ও আফিসের কর্ম্মচারীগণ কলিকাতায় আসিয়া থাকেন। তখন আমাদের গৃহে তাঁহাদেরে অনেকের শুভাগমন হয়। যাঁহারা জমিদার ও ব্যবসায়ী তাঁহারা অন্য সময়েও আসিতে পারেন। অনেকে মফঃস্বল হইতে এখানে তাঁহাদের রক্ষিতাদিগকে মাস মাসে টাকা পাঠাইয়া থাকেন। নোয়াখালির এক রায়-বাহাদুর, বর্দ্ধমানের এক জমিদার, ঢাকার এক বড় ঔষধ ব্যবসায়ী, রংপুরের এক উকীল ইহাদের নিকট হইতে আমি মাসিক কিছু টাকা পাইতাম। চীৎপুরে বিশিষ্ট সোণার বেণের মেয়ে প্রভা নামে আমার এক বন্ধু আছে। ময়মনসিংহের এক উকীল তাহার বাবু, ঢাকার সেই ব্যবসায়ীর সহিত ইহার নাকি পরিচয় ছিল। সেই সূত্রে ঢাকার লোকটী আমার ঘরে আসিত। প্রভার বাড়ীতে কলিকাতার এক ব্যারিস্টারে কুমারী কন্যাও আছেন। এইরূপে নিত্য নূতন লোক লইয়া সোনাগাছিতে আমার দিন কাটিতে লাগিল। বিশিষ্ট ঘরের পতিতা মেয়েদের সঙ্গে আমি একটু বেশী মেলামেশা করিতাম। এই ব্যারিস্টার কন্যার মত নির্ভিক পতিতা আমি কম দেখিয়াছি।

এই সময়ে একটি শোচনীয় দুর্ঘটনা আমার প্রত্যক্ষ হইল। আমি এস্থলে তাহার বর্ণণা করিতেছি। তাহাতে বুঝা যাইবে, কি ঘোরতর পাপ সমাজের মধ্য প্রবেশ করিয়াছে। ইহার প্রতিকার কিরূপে হইতে পারে তাহাও সমাজপতিদের ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

কলিকাতার মধ্যভাগে বাদুড়বাগান পল্লীর নিকট এক জমিদার বাস করে। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ নাকি সুপরিচিত বিখ্যাত ব্যক্তি। সেই জমিদার অতিশয় দুশ্চরিত্র। প্রতিবেশী গৃহস্থদের কুলবধূর উপর তাঁহার কুদৃষ্টি। তাঁহার দুষ্কার্য্যের সহায় কতকগুলি বন্ধু ও অনুচর আছে। ইহারা নানা কৌশলে গৃহস্থের কুলবধূদিগকে প্রলুব্ধ করিয়া প্রভুর কাম-লালসা তৃপ্তির জন্য লইয়া আসে। কখনও কলিকাতার প্রাসাদে, কখনও বা নিকটবর্ত্তী বাগান বাড়ীতে এই সকল পাপলীলার অনুষ্ঠান হয়।

গৃহস্থের কুলবধূরা কেহ প্রলোভনে স্বেচ্ছায় কেহ বা অনিচ্ছায় বাধ্য হইয়া আসিয়া থাকে। তাহারা অনেকেই গান জানে না, মদ্য পান ও করে না। এই প্রকার আমোদের জন্য সোনাগাছী অথবা রামবাগান হইতে পতিতা নারীদিগকে নেওয়া হইত। আমি এই জমিদারের বাগান বাড়ীতে দুই একবার গিয়াছিলাম। প্রতিরাত্রিতে এক শত টাকা লইতাম—গান গাওয়াই আমার কার্য্য ছিল। আমি মদ খাইতাম না। আরও দুই তিনটী বেশ্যা যাইত। তাহারাই মদ্য পানের আমোদে যোগ দিত।

একরাত্রিতে জমিদারের বাগান বাড়ীতে আমার যাইবার ডাক পড়িল। আমি আমার পাওনা টাকাকড়ি অগ্রিম লইয়া রাত্রি আটটার সময় তথায় যাই। দেখিলাম, একটী সুন্দরী যুবতী কুল-বধূকে আনয়ন করা হইয়াছে। তাহার বয়স ১৮।১৯ এইরূপ হইবে। গায়ের রং যেন কাঁচা সোণা—মুখখানি কোমল, লাবণ্য-মাখা। আমার প্রাণে বড় ব্যথা বাজিল। এই দুর্বৃত্ত জমিদারের পাপ প্রবৃত্তির কবলে কত সতীর বলিদান দেখিয়াছি। আমরাও

এই পাপের ভাগী। সে রাত্রিতে গানে আমার মন লাগিল না। আমি এই বধূটির সহিত কথাবার্ত্তার সুযোগ খুঁজিতে লাগিলাম।

আমোদ-প্রমোদ আরম্ভ হইল। জমিদার ও তাঁহার বন্ধুগণ মদ্যপান করিতে লাগিলেন। আমি দুই একটি গান গাহিলাম। অন্যান্য বেশ্যারাও তারপর নাচিতে গাহিতে আরম্ভ করিল। আমি গরমের অছিলায় বাহিরে আসিবার সময় সেই বধূটিকে আস্তে আস্তে বলিলাম "চল, একবার বাগানে বেড়াইয়া আসি।' আমরা উভয়ে পুকুরের ঘাটে একটি বেদীর উপরে বসিলাম। তাহার সহিত আমার অনেক কথা হইল। তাহার সার মর্ম্ম এই—বধূটির নাম অপরাজিতা দেবী। সে ব্রাহ্মণ কন্যা। বর্দ্ধমান জেলার কোন গ্রামে তাহার পিত্রালয়। কলিকাতার কোন মুখোপাধ্যায় যুবকের সহিত নাকি বিবাহ হইয়াছে। তাহার স্বামী পিসিমার কাছে থাকেন। এই পিসিমায়েরা কয়েক ভগ্নি, নিজ নিজ বাড়ীতে বাস করেন। তাহার স্বামীর পিতামাতা বা অপর কোন আত্মীয় স্বজন বোধ হয় নাই। তিনি অতি নিরীহ ও শান্ত স্বভাব। সর্ব্বদা পিসিমার মন যোগাইয়া চলেন। পিসিমার মৃত্যুর পর বাড়ী ও নগদ টাকা নাকি পাইবেন, ইহা তাঁহার আশা ছিল।

অপরাজিতার পিস্‌শাশুড়ী নাকি বিধবা অবস্থায়........ অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন, এইরকম দুর্ণাম আছে। এক্ষণে বার্দ্ধক্যে নিজে অশক্ত হওয়ায় ভ্রাতুষ্পুত্রের বধুদের সতীত্বের বিনিময়ে অর্থ উপার্জ্জন করেন। অপরাজিতার স্বামীর পুর্ব্বে আরও দুইবার বিবাহ হইয়াছিল। পর পর সেই দুইটি বধুর অগ্নিদাহে মৃত্যু

হয়। পিস্‌শাশুড়ী প্রকাশ করেন যে, বধূরা নিজের দেহে আগুণ লাগাইয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। অপরাজিতা তাহার স্বামীর তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী—তাহার একটি শিশুপুত্র আছে।

অপরাজিতাকেও তাহার পিস্‌শাশুড়ী পাপ পথে অর্থ উপার্জ্জন করিতে নিযুক্ত করেন, অপরাজিতা তাহাতে সম্মত নহে। ইহাতে পিস্‌শাশুড়ী তাহার উপর দিনরাত্রি উৎপীড়ন করিতেন! এক দুষ্ট ডাক্তার পিস্‌শাশুড়ীর প্রধান মন্ত্রণাদাতা ও দুষ্কার্য্যের সহায় ছিল। অপরাজিতা এতদিন তাহার সতীত্ব রক্ষা করিয়া আসিয়াছে

আমি অপরাজিতাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি এখন কি কর্‌বে?—তুমিও কি আত্মহত্যা করতে চাও?" অপরাজিতা বলিল, "আত্মহত্যা করব কেন?—আমার বাবা আছেন—ভাই আছেন—আমার ছেলে আছে—আমি আত্মহত্যা কর্‌ব না। তবে ঐ লম্পটের হাতে আমি সতীত্ব কিছুতেই দিব না, আমার প্রাণ যায়,—তাও স্বীকার।" আমি এই কিশোরী বধূর দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা ও অপূর্ব্ব আত্ম-সংযম দেখিয়া বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইলাম। এই বালিকা কোন শিক্ষা পায় নাই—লেখাপড়া জানে না; সাহিত্য-চর্চ্চা করে নাই, অথচ ইহার মধ্যে এমন তেজ ও শক্তি কোথা হইতে আসিল?

আমি বলিলাম "তুমি যদি ইহাদের কুপ্রস্তাবে সম্মত না হও, তবে কি হবে তা জান?" অপরাজিতা বলিল, "হাঁ জানি। এরা আমাকে মেরে ফেল্‌বে। আমার পিস্‌শাশুড়ী আমার ঐ দুই সতীনকেও মেরে ফেলেছেন, তারপর লোকের কাছে বলেছেন যে,

উহারা কাপড়ে কেরোসিন তেল দিয়ে আগুন লাগিয়ে মরেছে। কিন্তু মানুষ এত বোকা নয় যে, সে কথা আর বিশ্বাস কর্‌বে; পর পর দুইটী বৌ একই রকমে মারা যায়। আজ সারাদিন পিস্‌শাশুড়ীর সহিত আমার ঝগড়া হয়েছে। আমি বলেছিলাম যে, আমি সমস্ত কথা প্রকাশ করে দিব। শাশুড়ী আমাকে বলেন তাহ'লে তোর গলায় পা দিয়ে একেবারে তোর জীবন শেষ কর্‌ব! "আমিও সেই থেকে প্রতিজ্ঞা করেছি, এরা জীবিত অবস্থায় যেন আমার অঙ্গ স্পর্শ কর্‌তে না পারে।"

অপরাজিতার কথা শুনিতে শুনিতে আমার মাথা লজ্জায় নুইয়া পড়িল। ভাবিলাম, অপরাজিতা কোন স্বর্গের দেবী—আর আমি কোন নরকের কীট! হিন্দু সমাজে কেবল আমার মত কলঙ্কিনীই জন্মগ্রহণ করে না, অপরাজিতার মত সতীও জন্মগ্রহণ করেন। আমার দেহের দূষিত বাতাসে অপরাজিতার পবিত্রতা নষ্ট হইয়া যাইবে—এই ভাবিয়া তাহার সহিত আর অধিকক্ষণ কথা কহিলাম না। দেখিলাম, তাহার পিস্‌শাশুড়ী ও আর একজন লোক (অপরাজিতা বলিল, লোকটা নাকি......... ডাক্তার) সেইদিকে আসিতেছেন। আমি অপরাজিতার পায়ের ধূলা নিয়ে তাহাকে প্রণাম করিলাম। সে অগ্রসর হইয়া গেল— আমি একটা লতাকুঞ্জের অন্তরালে দাঁড়াইলাম।

সে রাত্রিতে আমি আর অমোদ প্রমোদে যোগ দিলাম না। শরীর অসুস্থ বলিয়া শীঘ্র চলিয়া আসিলাম। দুঃস্বপ্নে ভাল ঘুম হইল না। দুইদিন পরে খবরের কাগজে পড়িলাম, অপরাজিতার মৃত্যু হইয়াছে। তাহার পিস্‌শাশুড়ী পুলিশের নিকট

জানাইয়াছেন, সকালবেলা উনুনে আঁচ ধরাইবার সময় অসাবধানে কাপড়ে আগুন লাগিয়া অপরাজিতার মৃত্যু ঘটে। শবদেহের ডাক্তারী পরীক্ষায়, পুলিশ তদন্তে ও করোণারের বিচারে প্রকৃত রহস্য প্রকাশিত হইল না। এই ঘটনার পর প্রায় সপ্তাহ কাল পর্য্যন্ত আমি নিতান্ত মানসিক উদ্বেগ ও অশান্তিতে কাটাইয়াছি। এখনও অপরাজিতার মুখখানি আমার মনে আছে।

এদেশের ঘরে ঘরে এমন কত শোচনীয় দুর্ঘটনা হইতেছে, সে সংবাদ কি সমাজের কর্ত্তারা রাখিয়া থাকেন?—সতী-শিরোমণি বালিকাবধূর অভিশাপে সমাজ রসাতলে যাইতেছে। দুর্ব্বৃত্ত লম্পটেরা অর্থের বলে মান মর্য্যাদা আদায় করিয়া সমাজের মধ্যে নির্ভয়ে বুক ফুলাইয়া বেড়ায়।

কালীদাসী একদিন আমার বাড়ীতে আসিল; তাহার চেহারা দেখিয়া বুঝিলাম, সে অতিশয় দুরবস্থায় পড়িয়াছে। তাহার মুখে শুনিলাম, রেস্ (ঘোড়-দৌড়ের জুয়াখেলা) খেলিয়া এবং মদ খাইয়া তাহার সেই ভাটিয়া বাবু সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে। তাহার কারবার উঠিয়া গিয়াছে। কালীদাসী এখন এক মাড়োয়ারীর কাছে বাঁধা। কিন্তু হাতে টাকাকড়ি নাই। আমার কাছে গহনা বন্ধক রাখিয়া পাঁচশত টাকা কর্জ্জ চায়।

যাহারা পতিতালয়ে যাতায়াত করে, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকের দুইটী প্রধান নেশা জন্মে—ঘোড়দৌড়ের জুয়াখেলা এবং মদ্যপান। রেস্ খেলিয়া অনেকে হাজার হাজার টাকা পায়—এইরূপ শুনা যায়—কিন্তু তাহা থাকে না; যে পথে উৎপত্তি, সেই পথেই নিষ্পত্তি। রেসের দিন বেশ্যা

পল্লীতে খুব ভিড়। যে খেলায় জিতিয়া কিছু লাভ করিয়াছে, সে যেমন আমোদ করিতে সেখানে যায়—যে হারিয়া সমস্ত খোয়াইয়াছে সেও তেমন দুঃখ ভুলিতে সেখানে ছুটিয়া যায়।

আমার হাতে টাকা ছিল না। ঊষাবালা নামে একটি স্ত্রীলোক আমাদের বাড়ীতে নূতন আসিয়াছিল, তাহার কাছে কিছু নগদ টাকা আছে জানিতাম। কালীদাসী যে গহনা আনিয়াছিল, তাহার মূল্য প্রায় এক হাজার টাকা। সুতরাং আমার কথায় সম্মত হইয়া ঊষাবালা ঐ গহনা বন্ধক রাখিয়া কালীদাসীকে পাঁচ শত টাকা দিল।

আমি পরে জানিয়াছি, কালীদাসী রেস্ খেলিয়া ও মদ খাইয়া সে টাকাও উড়াইয়াছে। ভাটিয়া বাবুর সংসর্গে কালীদাসীকে রেস ও মদের নেশায় পাইয়াছিল। এই পথেই সে উচ্ছন্ন গিয়াছে। আমি আরও জানিলাম, এই নূতন মাড়োয়ারী যুবকটীর সহিত কালীদাসীর পূর্ব্ব হইতেই গুপ্ত-প্রণয় ছিল। এইসব দেখিয়া শুনিয়া তাহার প্রতি আমার আর বিন্দুমাত্র সহানুভূতি রহিল না। ঊষাবালার ঋণ সে পরিশোধ করিতে পারে নাই।

কালীদাসী এখনও বাঁচিয়া আছে। সে আমারই মত তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে। কিছুদিন পূর্ব্বে তাহাকে কলিকাতার কোন অপরিচ্ছন্ন বস্তীতে এক বিড়ীওয়ালা মুসলমান যুবকের সহিত যেভাবে ইয়ারকি করিতে দেখিলাম—তাহাতে বুঝিতে পারিয়াছি; পতিতাদের শীঘ্র মরণ হয় কেন। সেই ২৬ বৎসরের যুবতীর দেহ ৬০ বৎসরের বৃদ্ধের মত ক্ষীণ শুষ্ক, অস্থি-চর্ম্ম, সার: মদ্যপানের ফলে নানারোগের আক্রমণ,

পরণে একখানা কাপড়ই যথাসর্ব্বস্ব—দুইবেলা আহার জুটে না—তার উপর অত্যাচার! আমি কালীদাসীর সহিত কথা কহিলাম না। মোহান্তজীর উপদেশ আমার মনে হইল—"দৈবকে অতিক্রম করিবার শক্তি কাহারও নাই। কর্ম্মফলই দৈব।"

ঊষাবালার কথা এইখানেই বলিব। সে ফরিদপুরের কোন ব্রাহ্মণ উকিলের পরিণীতা স্ত্রী, পিত্রালয় হইতে কয়েকজন ধনী মুসলমান তাহাকে অপহরণ করিয়া কলিকাতার নিকটবর্ত্তী বেলিয়াঘাটায় রাখে। নারী-রক্ষা-সমিতির কর্ম্মী শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র আতর্থী মহাশয় সংবাদ পাইয়া তাঁহার কর্ম্মীদের দ্বারা ও পুলিশের সাহায্যে ঊষাবালাকে উদ্ধার করেন। এইজন্য পুলিশ-আদালতে মামলা চলিতে থাকে। তাহার স্বামী তাহাকে স্ত্রী বলিয়া অস্বীকার করেন। ঊষাবালা কিছুদিন সঞ্জীবনী সম্পাদক, নারী-রক্ষা সমিতির পরিচালক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের বাড়ীতে অবস্থান করে। এই ঊষাবালার কথাই আমি পূর্ব্বে একবার উল্লেখ করিয়াছি। সে আমার নিকট বলিয়াছে "কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় আমাকে নিজ কন্যার মত দেখতেন। তিনি আমাকে লেখাপড়া শিখাইবার ব্যবস্থা করলেন; শিল্প কাজ শিখবার জন্য এক স্কুলে ভর্ত্তি করে দিলেন। কিন্তু আমি কিছুতেই মনস্থির করতে পারলাম না। দুষ্প্রবৃত্তি দমন করা আমার পক্ষে অসাধ্য হ'য়ে উঠল। আমার বয়স আঠার বৎসরের বেশী—সুতরাং তাঁরা আমাকে আর জোর করে রাখতে পারেন না। নানা অবস্থার পাক চক্রে ঘুরে আমি এই পথে এসেছি।' কিছুদিন আমাকে রাস্তায় বসে পান বিক্রীও করতে হ'য়েছিল।

নারী-নিগ্রহের বিশেষ উপদ্রব আরম্ভ হইলে আমি একজন ভদ্রলোককে প্রায়ই বেশ্যাদের ঘরে আসিতে দেখিতাম, তিনি আমাদের নিকট তারকবাবু নামে পরিচিত, পতিতাদের মধ্যে চারি পাঁচজন তাঁহার বিশ্বাসভাজন ছিল, আমাকেও তিনি বিশ্বাস করিতেন। আমরা ইহা বিশেষরূপ লক্ষ্য করিয়াছি, তিনি কোন কুমতলবে বেশ্যালয়ে আসেন না। তিনি নারীরক্ষা সমিতির কর্ম্মী—না পুলিশের গোয়েন্দা, তাহা জানি না, ; কিন্তু আমাকে তিনি বলিয়াছেন, আজকাল অনেক দুর্ব্বৃত্ত গৃহস্থ ঘরের মেয়ে বৌকে চুরি করিয়া বেশ্যা গৃহে লুকাইয়া রাখে—কোন স্ত্রীলোক কলঙ্কের ভয়ে বাধ্য হইয়া প্রণয়ীর সহিত স্বেচ্ছায় পতিতালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে—এই সব সন্ধান লইবার জন্যই তিনি গোপনে বেশ্যাদের নিকট যাতায়াত করিয়া থাকেন, আমরা তাঁহার কার্য্যে যথাসাধ্য সাহায্য করিতাম।

একদিন তারকবাবু আমাকে বলিলেন, "তোমাদের সম্মুখের সমস্ত বাড়ীটা ভাড়া নিয়ে যে নূতন মেয়েটী রয়েছে, তা'র সম্বন্ধে একটু বিশেষ খোঁজ করে দেখ্‌বে ; আমার প্রয়োজন আছে।" আমি তার পরদিন হইতে সেই বাড়ীতে যাতায়াত করিতে লাগিলাম। অল্পদিনের মধ্যেই মেয়েটীর সহিত আমার ভাব হইল। তার ভিতরের কথা অনেকটা জানিলাম।

কয়েকদিন পর তারকবাবু আসিলে আমি বলিলাম, "মেয়েটি ব্রাহ্মণ বংশীয়া—নাম সুরুচিবালা, তাহার পিতা একজন অবসরপ্রাপ্ত ইঞ্জিনীয়ার, এখন কাশীতে আছেন, হুগলী জেলার কোন ব্রাহ্মণ যুবকের সহিত সুরুচির বিবাহ হয়। সুরুচি বলে যে, তাহার স্বামী আর এক বিবাহ করিয়াছিল। সুরুচির স্বামীগৃহে

স্থান হয় নাই। সে কাশীতে পিতার নিকট থাকিত। বাল্যকাল হইতে উপন্যাস নাটক নভেল পড়ায় তাহার খুব ঝোঁক ছিল। ক্রমশঃ সে উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির হইয়া উঠে। পিতামাতার শাসন সে মানিত না, কাশীতে দুষ্ট লোক অনেক আছে, সুরুচি কোন দুর্ব্বৃত্তের সহিত পলায়ন করিয়া কলিকাতায় আসে। এখানে অনেকের হাতে পড়িয়া সে কলুষিত হয়। পুলিশ তাহাকে আপত্তি-জনক অবস্থায় পাইয়া গ্রেপ্তার করে, পুলিশ আদালতে তাহাকে নেওয়া হইলে বিচারক বিষম সঙ্কটে পড়িলেন, নারীরক্ষাসমিতির অক্লান্ত কর্ম্মী ও সম্পাদক শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র আতর্থী মহাশয় সেদিন অন্য কোন কার্য্য উপলক্ষ্যে আদালতে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাকে বিচারক চিনিতেন তিনি মহেশবাবুকে বলিলেন "আপনি এই মেয়েটিকে নিয়ে যান, নারীরক্ষা সমিতি হইতে ইহার যথোচিত ব্যবস্থা করুন।"

সুরুচি কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের ঘরে আশ্রয় পাইল, তিনি পিতৃস্নেহে ইহাকে সৎপথে আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু সুরুচি এই সরল-প্রাণ, উদার হৃদয়, মহানুভব ব্যক্তিকে প্রতারণা করিয়া চলিয়া আসিল, দুষ্ট লোকের প্রলোভনে পড়িয়া সে পাপের পথই বাছিয়া লইল। এক্ষণে এক ধনী পার্শী যুবক তাহাকে বাঁধা রাখিয়াছে, মেম-সাহেবদের ষ্টাইলে সে থাকে—ঘাড়ের উপর পর্য্যন্ত ছোট করিয়া চুল ছাঁটা—হাঁটু পর্য্যন্ত স্কার্ট, খোলা হাতের রংএর সহিত মানান-সই সিল্কের মোজা,—পরিস্কার হিন্দী বলে; ইংরাজীও কিছু শিখেছে।"

তারকবাবু সমস্ত মনোযোগের সহিত শুনিয়া বলিলেন "সে কৃষ্ণবাবুর বাড়ী হইতে পলাইল কেন, তাহা বুঝি জান না। আমি

বলিলাম—না—সে কথাত সুরুচি কিছু বলে নাই। তারকবাবু বলিলেন, "সে কৃষ্ণবাবুর জামাতা শচীনবাবুর একটী সোনার ঘড়ী সরাইয়াছিল, এজন্য মহেশবাবু তাহাকে পুনরায় আদালতে দিয়া আসেন। তথায় সে বেশ্যাবৃত্তি করিবার অনুমতি চায়, বিচারক অগত্যা তাহাকে তথাস্তু বলিয়া ছাড়িয়া দেন।"

আমাদের এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছিল এমন সময় সুরুচি হাসিতে হাসিতে আমার ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল, তাহার হাতে নানাবিধ ফুল, ফল, কেক্, বিস্কুট, প্রভৃতি রহিয়াছে। আমি তাহাকে বসিতে বলিলাম, সে দাঁড়াইয়াই বলিতে লাগিল "মানদি, আজ মোটরে চড়ে হগ্ সাহেবের বাজারে গিয়েছিলুম, এই সব কিনে এনেছি, কাল সকালে আমাদের বাড়ীতে তোমার চা-এর নিমন্ত্রণ, যেও। ভাল কথা, আজ সেই বুড়ো মহেশ আতথার সঙ্গে দেখা হ'ল, আমি বল্লুম, কি বুড়ো কেমন আছ?

তারকবাবু সুরুচির সম্বন্ধে কি করিয়াছিলেন জানি না, আমি সুরুচি ও উহার কথা ভাবিয়া দেখিলাম, ইহারা আমারই মত হতভাগিনী। যৌবনের প্রারম্ভে প্রলোভনের বশীভূত হইয়া সংযমের বাঁধ একবার ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—আর ত অকূল সমুদ্রে কূল পাইতেছে না। ইহারাও আমার মত সৎপথে আসিবার সুযোগ পাইয়াছিল; কিন্তু আমারই মত ইহাদের অদৃষ্টেও দোষ হয় আরও দুঃখ ভোগ আছে তাই অনিবার্য্য কর্ম্মফল কেহ খণ্ডাইতে পারিল না।

দশম

অভিনব পন্থা

সোনাগাছীতে আসিবার পর আমার উপার্জ্জন অনেক কমিয়া যায়। শরীরও নানা রোগাক্রমনের ফলে ক্রমশঃ ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইতে থাকে, ঘরভাড়া, খাওয়া পরা ঠাকুর, চাকর, ঔষধাদি বাবদে বহু টাকা আমার খরচ হইত। পূজা-পার্ব্বণও কিছু করিতাম, বিশেষতঃ সরস্বতী পূজা আমার কখনও বাদ যাইত না, আমার রোজগারে আর কুলাইয়া উঠিত না।

একজন উকীল ও একজন ব্যারিষ্টার আমার ঘরে আসিত. ইহারা আইন ব্যবসায়ে যেমন পরস্পর সহযোগী ছিল,—আমার কাছেও সেই ভাবেই,যাওয়া আসা করিত। আমাদের পতিতা-নারী সমাজের একটা রীতি এখানে উল্লেখ করিতেছি। বাবুর বন্ধু বা পরিচিত ব্যক্তির সহিত কুভাবে আসক্ত হওয়া পতিতা-নারীর পক্ষে নিন্দার বিষয়; অবশ্য প্রলোভনের বশীভূত হইয়া অনেক বেশ্যা গোপনে এই নিয়ম পদ দলিত করিয়া থাকে কিন্তু পতিতা সমাজে তাহার দুর্ণাম রটে। ভদ্র সমাজে অনেক সময় যে সকল বন্ধু বিচ্ছেদ দেখা যায় তাহার কতক এই বেশ্যাপল্লীর কাহারও বন্ধু লইয়া ঘটে, এমন কি ইহার ফলে মারামারি খুনোখুনি পর্য্যন্ত হইয়া যায়।

আমি অভাবে পড়িয়া অর্থলোভে এই দুই বন্ধুকে প্রণয়ীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলাম। তাহাদের মধ্যেও কোন প্রতিদ্বন্দিতার ভাব দেখি নাই।

আমার এ প্রকার কার্য্যের জন্য পতিতারা অনেকে আমায় নিন্দা করিত, আমি ভাবিতাম সমুদ্রে যার শয়ন, শিশির বিন্দুতে তার কি ভয়?—পতিতাই যখন হইয়াছি তখন কলঙ্কের পসরা ত মাথায় নিয়াছি। 'বলিদান' নাটকের পাগ্‌লীর সেই গানটী মনে পড়ে—,

কলঙ্ক যার মাথার মণি,
লুকান প্রেম তারই সাজে,

নরকে যখন ডুবিয়াছি তখন একেবারে ইহার গভীর তলায় যাইয়া—দেখি পরতে পরতে কত রকমের স্রোত প্রবাহিত হইতেছে।

ক্রমশঃ দেখিলাম, এই উকীল ব্যারিষ্টার বাবুদের পরিচয়ে দুই একজন উঁচু দরের লোক আমার ঘরে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের নিকট অনেক টাকা পাইলাম। আমার মাথায় এক নূতন ফন্দি আসিল। আমি জানিতাম, কলিকাতায় অনেক বড় বড় লোকের কাছে এই উকীল ব্যারিস্টারদের যাতায়াত ও আলাপ পরিচয় আছে। সেই সকল বড় লোককে আমার ঘরে আনিবার জন্য আমি ইঁহাদিগকে নিযুক্ত করিলাম, কথা রহিল, টাকার অর্দ্ধেক তাহারা দুইজনে পাইবে।

আমি এবারে খাঁটী বেশ্যা হইলাম। রামবাগানে থাকিতে নিম্নশ্রেণীর লোকেরা রাস্তা হইতে দুই একটী বাবুকে ফুস্‌লাইয়া আমার ঘরে আনিত। পুলিশ কমিশনার টেগার্ট সাহেবের শাসনে তাহাও বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। কলিকাতা সহরে ভদ্রলোকও

বেশ্যার দালালী করে তাহা জানিতাম। কোন কোন পতিতা নারীর নিকট আমি ভদ্রলোক দালাল রাখিবার পরামর্শ পাইয়াছিলাম, কিন্তু তখনও আমার বিবেক ও নীতিজ্ঞান একটু ছিল বলিয়া তাহা পারি নাই। আজ পাপ পথের শেষ সীমায় আসিয়া হৃদয়ের অবশিষ্ট সদ্ভাবটুকুকে পদ দলিত করিতে আমি আর ইতস্ততঃ করিলাম না।

আমার উকীল ও ব্যারিষ্টার দালাল দুইটী বেশ চতুর ও বুদ্ধিমান দালালী কার্য্যে তাহারা খুব পটু। দিনের পর দিন তাহারা আমার ঘরে বড় বড় লোক আনিতে লাগিল। কেহ, উচ্চশিক্ষিত জমিদার-পুত্র, -কেহ রাজনৈতিক নেতা, কেহ খ্যাতনামা চিকিৎসক, কেহ সমাজ সংস্কারক,---কেহ ধনী-ব্যবসায়ী। ইহাদের মধ্যে প্রৌঢ় ও বৃদ্ধের সংখ্যাই অধিক। বাংলাদেশের বাহিরের লোকও আসিতে লাগিল।

চারি পাঁচ মাসের মধ্যেই আমার হাতে কিছু টাকা জমিল। আমার দালালেরাও প্রচুর অর্থ পাইল। আমি আমার মনের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, আমি কত ক্ষুদ্র, কত হীন হইয়াছি, নিত্য মিথ্যাচার, প্রতিদিন প্রতারণা,—কেবল অর্থগৃধ্নুতা—ইহার ফলে আমার হৃদয় যেন শ্বাপদ সঙ্কুল অরণ্যের মত হইয়া উঠিল। দর্পণে মুখ দেখিয়া বুঝিলাম আমার সে লাবণ্য নাই—সে কান্তি নাই, নরকের ঘৃণিত ছবি যেন ফুটিয়া বাহির হইয়াছে।

মিস মুখার্জ্জি

বয়োবৃদ্ধির অনুপাতে সোনাগাছিতে আবার আমার গ্রাহক অনুগ্রাহকের সংখ্যা দিন দিন হ্রাস পাইতে লাগিল। কিন্তু দুর্দ্দিনের সে সূত্রপাতেও আমার ঐ উকিল ব্যারিষ্টার বন্ধু আমাকে ত্যাগ করেন নাই ইঁহাদিগের পরামর্শে আমি স্থান ত্যাগ পূর্ব্বক ভবানীপুরে আসিয়া নূতনভাবে জীবিকা অর্জ্জন আরম্ভ করিলাম। মনস্তত্ত্ববিদগণ জানেন এবং দীর্ঘকাল এই ঘৃণিত ব্যবসায় উপলক্ষে আমিও এ অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছিলাম যে জগতে যাহা সুলভ ও সহজপ্রাপ্য তাহা প্রকৃত পক্ষে সুন্দর হইলেও তত মোহজনক হয়না; কিন্তু যাহা দুষ্প্রাপ্য ও সর্ব্বাপেক্ষা দুর্লভ, তাহাই সমধিক প্রলোভনের বস্তু। আমি ভবানীপুরে একটা সুরম্য ভবনে মিস্ মুখার্জ্জি নামে ব্যারিষ্টার সাহেবটির শ্যালিকারূপে সাধারণের দুষ্প্রাপ্য হইয়া আসর জমাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। ফলও ফলিল বাল্যে এবং কৈশোরে বিদ্যা অর্জ্জন করিয়াছিলাম, পরে মানব সমাজের নানা-স্তরের নানাপ্রকার জীবের সহিত অবাধ মিলনে মনুষ্য হৃদয়ের অতি গূঢ় তত্ত্ব ও সংগ্রাম করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম, সুতরাং মিস্ মুখার্জ্জি-রূপে যখন সভ্য বন্ধু মহলে হাস্যরসিকতার অভিনয় করিতাম, যখন আপ-টু-ডেট্ সাজ সজ্জার হাবভাব বিলাসে বিগত-প্রায় যৌবনশ্রীর নূতন সংস্করণ লুব্ধ লোক-চক্ষুর সম্মুখে ধরিতাম,

যখন পার্কে হাত ধরাধরি করিয়া ভগিনীপতি ব্যারিষ্টারের সঙ্গে সান্ধ্য-সমীরণ উপভোগ করিতাম, যখন একটিমাত্র কটাক্ষে অপরিচিতকে পরিচিতের পর্য্যায়ভূক্ত করিয়া বাড়িতে আনিয়া স্বহস্তে পরিপাটিরূপে চা পান করাইয়া পরিতৃপ্ত করিতাম ও সঙ্গলিপ্সার দুর্দ্দম্য বেগ তাঁহাদের হৃদয়ে সৃষ্টি করিয়া পরম তৃপ্তিলাভ করিতাম; যেন আমার হৃদয়ের সে আবিল স্বার্থদুষ্ট রূপ কাহারও নয়নপথে পড়িত না, বরং ঊর্ণনাভের বিস্তৃত জালে তাঁহারা আবদ্ধ হইয়া আমার সহিত নিভৃত আলাপের অনুসন্ধান করিতেন। অবশ্য বলিতে হইবে আমিও কাহাকেও ....। যাঁহার যখন উদয় হইত তিনিই যে আমার হৃদয় কমলের একমাত্র ভৃঙ্গ এবং অন্য সকলকেই মরিচীকা লইয়া ফিরিতে হইবে তাহাও বুঝাইয়া দিতাম।

কত সতীত্বের ভানই করিয়াছি, আজ তাহা স্মরণ করিলেও হাস্য সম্বরণ করিতে পারি না। একদিন সন্ধ্যার সময় সম্মুখে টিপয়ের একদিকে মিঃ গোস্বামী ও অপর দিকে প্রফেসর চৌধুরী। উভয়েই ধনী, উভয়েই সুপুরুষ। আমি হারমোনিয়মটি অঙ্কে স্থাপন করিয়া বেশভূষার পারিপাট্যের পরিবর্ত্তে ইচ্ছাকৃত একটু অযত্নের ভাবে উন্মাদনা বৃদ্ধি করিয়া গান ধরিয়াছিলাম—

আজি অভিসার রজনী!

কোথা সে আমার কতদূরে তার দেখা পাব বল সজনি!

প্রেমের কমল ফুটেছিল তারই আলোক রেখার পরশে

দিন দিন করি বিতানু জীবন তাহারই পাবার হরষে।

মিঃ গোস্বামী বলিলেন—এখন বলুনতো কে সে এই ভাগ্যবান!

আমি বলিলাম—সে একটী মানস-পুরুষ, একটী আদর্শ প্রণয়ী, বাস্তব জগতের কোন প্রাণী না হইতেও পারে। এমন সময় মিঃ চৌধুরী আমার পশ্চাৎদিকে আঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক বলিলেন, ঐ যে সে পুরুষ-প্রবর আপনি আসিয়াই ধরা দিল। আমি ফিরিয়া চাহিতেই দুজনে উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন। আমি দেখিলাম আমার উকীল বাবুর সহিত আধুনিক সমাজের একটী নিতান্ত অচল বেশধারী অর্দ্ধবয়স্ক মাণিক। আহা তাতে ছিলনা কি? ঘড়ি, চেন, গন্ধতেল, আতর, চস্‌মা, ছরি, শাল, ফুলমোজা, পানে পানে ফাটা ফাটা একজোড়া ঠোঁট, মুখের মত চলন বলন, এবং যাহা কিছু অশোভনীয় তার সবই। তিনি আসিয়াই বলিলেন—আমরা বাহিরে দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া আপনার অপ্সরা কণ্ঠ শুনিতেছিলাম। এ রকম আর একবার শুনে ছিলাম। ওঃ—বহুদিনের কথা, এই কলিকাতা রামবাগানের মতি বিবির বাড়ী। আমি পূর্ব্ববঙ্গের একজন পাট ব্যবসায়ী। আমার পয়সা খায়নি এমন মেয়ে মানুষ সহরে কম। কিন্তু আজ তোমার বাড়ী যা শুনলাম, জীবনে আর কোথাও তা শুনবনা, তোমার কানাচ আর ছাড়ব না। এঁরা কারা! এই কথা বলিয়াই তিনি একটি গিনি দিয়া আমাকে সম্মানিত করিলেন। তাঁদের ভাব দেখিয়া আমি একটা ঘৃণাসূচক ইংরাজী শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাঁকিলাম—দরোয়ান দরোয়ান! দরোয়ান হাজির হইলে বলিলাম, ইস্কো নিকাল দেও। পরে নিজেই সে কার্য্যের ভার লইয়া তাঁহাকে আমার সঙ্গে আসিতে ইঙ্গিত করিলাম এবং রাস্তার ধারে গেটের কাছে আনিয়া

বিদায় দিলাম। বলিলাম, আমি তোমারই; তবে সময় বুঝিয়া কথা কহিতে হয়। যাঁরা বসিয়া ছিলেন তাঁরা আমাকে সহোদরার মত দেখেন।

ক্রমশই রাত্রি অধিক হইতে লাগিল; দুজনেই নাছোড়বান্দা। উভয়েরই ধৈর্য্যের সীমা নাই। মিঃ গোস্বামী পকেট হইতে হ্যামিল্টনের বাড়ীর তাঁর সোণার সিগারেট কেস্‌টী টেবিলের উপর রাখিয়া দিলেন, আমি কেস্ হইতে সবগুলি বাহির করিয়া একটী কাগজের মোড়কে বন্ধ করিয়া কেসটি আলমারী বন্ধ করিয়া বলিলাম—অন্ততঃ ঐ মূল্যবান জিনিষটির অনুরোধেও আপনাকে প্রতি সন্ধ্যায় একবার মিস্ মুখার্জ্জির শরণাগত হ'তে হবে; কেবল যে দিন হ'তে মিস্ মুখার্জ্জিতে আপনার স্নেহের অভাব দেখ্‌ব সেইদিন এটা ফিরে পাবেন। মিঃ গোস্বামী একটু বিহ্বল ভাবে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন—সেটা কি কখনও সম্ভব হবে? আপনাকে ভুল্‌ব? মি চৌধুরী হাসিয়া বলিলেন তাহলে কেস্‌টি মহাশয়ের পকেটে প্রত্যাবর্ত্তনও আর করলনা দেখ্‌ছি। মিঃ গোস্বামী তাঁর সিগারেট কেস্‌টির অসম্পত্তির জন্য অনুতপ্ত হইয়া একটু নীরব ভাব অবলম্বন করিতেই আমি একটু আঘাত করিলাম—বলিলাম, কি রকম, বড় বাড়ীর কথা ভাবছেন নাকি? তিনি বল্লেন সে আবার কি? আমি বল্লাম—Lion's denএ (সিংহের গহ্বরে) একটা beautiful cubএর (সুন্দর সিংহের বাচ্চা) শিকারে যাবেন ভাবছেন ত? তিনি what a fiction বলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেই মিঃ চৌধুরী বলিয়া উঠিলেন—But facts are more stranger than

fiction, (অর্থাৎ বাস্তব জগতের ঘটনা গুলি কল্পনা রাজ্যের অদ্ভুত ব্যাপার অপেক্ষাও অধিকতর আশ্চর্য্যজনক হয়ে থাকে)।

মিস্টার গোস্বামীর অন্তর্ধানের সঙ্গেসঙ্গেই আমার যেন একটু শিরঃপীড়া বোধ হইতে লাগিল। আর একটি অসুখ, যাকে Palpitation of the heart (যাকে হৃৎপিণ্ডের ধরফড়ানি বলে) সেই রোগটি সময় বুঝে দেখা দিল। দুরাত্মার ছলের অভাব নাই, আমি বেশ একটু যেন কাতর হইয়া শোফায় অঙ্গ ঢালিয়া দিলাম্; আর, ওঃ—লাইট্‌টা কি ষ্ট্রং বলিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিতেই মিঃ চৌধুরী নিঃশব্দে আলোকটি সুইচ্ অফ্ করিয়া দিলেন। তখন চাঁদের কিরণ ঘরে আসিয়া পড়িয়াছিল; মিঃ চৌধুরী আমার নিকটে তাঁর চেয়ারখানি টানিয়া আনিতেই আমি তাঁর হাতটি টানিয়া আনিয়া বুকের উপর রাখিয়া বলিলাম—আহা, মিঃ চৌধুরী, আজ গোস্বামীকে কি রকম জব্দ করেছি বলুনত! ৫০০৲ টাকার কেসটি যে হজম করলাম এটি অবশ্য বুঝতে বাকি নেই, আরও কি আসবে বলেন! তিনি যেমন একটা উত্তর দিতে যাইবেন, এমন সময় তাঁর হাতের আংটিটা খুলিয়া লইয়া বলিলাম, আপনাদের উভয়েরই আজ পরীক্ষা। আগের আঁচেই ভাই প্রণয়ের গাদ কাটে, বলিয়া গুণ গুণ করিয়া একটু সুর তুলিলাম ঃ—

ভালবাসার কষ্টি পাতরে
আজ তোমার কষব পরাণ......

এমন সময় ব্যারিষ্টার বন্ধুটি আসিয়া চক্ষে অন্ধকার দেখিলেন, চাঁদের আলোয় দুটি প্রাণীর অস্তিত্ব অনুভব করিয়া, তাহলে Let

me retire for the night, (তা'হলে আজ রাত্রের মত বিশ্রাম লাভ করি) বলিয়া দরজাটি বাহির হইবার সময় টানিয়া দিয়া গেলেন্। আমার এই দালাল বন্ধু দুটির নিজ নিজ ব্যবসায়ে পসার হয় নাই, সেই জন্য আমার এই কার্য্যে তাঁহারা সহায়তা করেন, দালালির অংশ আধাআধি।

কিন্তু আশা মিটে কৈ ? খরচও সঙ্কুলান হয় না, বিশেষতঃ এই মহাপাপের পয়সারও আবার বখরাদার দুইজন। একদিন ব্যারিষ্টারকে বলিলাম—তুমি একেবারে অকর্ম্মা। এত জায়গায় জাল ফেল্‌লে একটিও রুই কাতলা গাঁথতে পারলেনা। রাজধানীর আশে পাশে জাল হাতে করে ঘুরলে হবেনা, একটু দূরে যাও। যে বাঙ্গালটি, সেই যে পাট ব্যবসায়ী গুহ, সেটি বেশ জবর মক্কেল ছিল, দর্শনেই এক গিনি, স্পর্শনে হয়ত পাটের সওদাগরী জাহাজও খান কতক এই গহ্বরে রেখে যেত। পারবে ধরতে তাকে!

কিছুদিনের জন্য ব্যারিস্টার দালাল উধাও হইলেন। শেষে একটী প্রকাণ্ড কাণ্ড করিয়া বসিলেন। আসাম হইতে বেশ একটি ভদ্রবেশধারী ধনবান মনুষ্য গেপ্তার করিয়া আনিলেন। তিনি চিরকুমার ব্রত প্রচারের জন্য তাঁহার উৎসাহের অভাব নাই। তিনি প্রথম দিনেই আমাদিগের আতিথ্য স্বীকার করিয়া রজনীযোগে চির-কৌমার্য্যের মহিমা কীর্ত্তন সুরু করিয়া দিলেন। আমি কপটাচারে চিরদিনই অভ্যস্ত। গভীর রাত্রে তাঁহার সঙ্গে একাকী এ বিষয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব বলিয়া রাত্রির জলযোগ শেষ করিয়া লইলাম।

মধ্যরাত্রে আলো জ্বালিয়া, ফ্যান্ খুলিয়া দিয়া, যুবক যুবতীর পরস্পরের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণকে লক্ষ্য করিয়া তাহারা বিরুদ্ধে কঠোর অশুভ মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিলাম। বলিলাম, ঈশ্বরের এই পবিত্র রাজ্যে মানুষ নানাবিধ কৃত্রিম উপায়ে পাপ-পথে সর্ব্বদা নর নারীকে আকর্ষণ করিতেছে। উদাহরণ স্বরূপ তাঁহাকে একটা প্যাকেট হইতে কতকগুলি প্যারিসের ছবি খুলিয়া এক একটা করিয়া দেখাইতে লাগিলাম।

যে পাকা শিকারী সে কখনও চিড়িয়ার প্রাণ বধ করেনা, সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি জবরদস্ত হিংস্রজন্তুই তাহাদের শিকারের বস্তু।

যখন ছবিগুলি দেখাইয়া, তাহার মধ্যে কোন্ অংশ কিরূপ অশ্লীল, বিশেষভাবে তাহার বিচার করিতে লাগিলাম, দেখিলাম যেন তাহার আস্ফালন অনেকটা মন্দীভূত হইয়াছে, তিনি আগ্রহ সহকারে সেগুলি যেন দুই চোক দিয়া গিলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাহার পর বলিলাম, নর নারীর বিবাহে বা প্রণয় মিলনে এই সব ঘৃণিত কার্য্যই সম্পাদিত হয়। আপনি যদি চিরকুমার ব্রত ধারণ করিয়া জীবন যাপন করিতে পারেন আমিও আপনার সহিত চিরকুমারীরূপে এই মহান্ ধর্ম্ম প্রচারে সহায়তা করিব। তিনি বলিলেন, এরূপ ছবি আরও আছে। আমি, তখন একটী বাক্স আনিয়া তাঁহার নিকট হাজির করিলাম; তিনি উৎসাহ সহকারে আমার নিকট এমন ভাবে ঘেসিয়া বসিলেন যে কপট চিরকুমারী আমি তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকট হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য চেয়ারটি সরাইয়া লইলাম। তিনি বলিলেন—আপনি কিজন্য এতগুলি ছবি সংগ্রহ করিয়াছেন? আমি বলিলাম, পাপ হইতে দূরেতে থাকি-

হইলে পাপের স্বরূপ পূর্ব্বে চিনিয়া লওয়া প্রয়োজন, তাই এই গুলি যত্ন করিয়া রাখিয়াছি। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, যখন নিভৃতে এইগুলি সম্মুখে রাখিয়া মনে মনে ইহাদের কুৎসিত ভাবগুলি আলোচনা করি, তখন কি একটা ঘৃণিত লিপ্সা প্রাণে জাগিয়া উঠে; যেন, ছিছি সে কথা বলিতে লজ্জা মনে হয়। আপনি চির-কুমার ব্রতধারী, বলিতে লজ্জা করে, তখন মনে হয়—বোধ'হয় অতি নিকট-আত্মীয় বিরুদ্ধ সম্পর্কীয় একজন সুবেশধারী যুবকের সঙ্গও আমার পক্ষে নিরাপদ নহে।

ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া তিনটা বাজিল। আমি বিশ্রামের প্রস্তাব করিলাম তিনি সম্মত হইলে, উভয়ে একই কক্ষে শয়ন করিলাম, আমি নিদ্রার ভান করিয়া নীরব রহিলাম, কিন্তু জাগ্রত ছিলাম, তিনিও নিদ্রা যাইতে পারিলেন না। আমি পূর্ব্বেই পরিচয় পাইয়াছিলাম, তিনি মহাধনী। এক্ষণে সাড়া দিয়া বলিলাম—এই বাড়ীখানি আমি ভাড়া লইয়াছি, বিশ হাজার টাকা লইলে এখানি নিজস্ব করিয়া, এইখানে দু'জনে থাকিয়া এই মহামন্ত্রের প্রচার করিতে সমর্থ হই, নচেৎ শীঘ্রই এ স্থান ত্যাগ করিতে হইবে। তিনমাসের বাড়ীভাড়া ১০০৲ টাকা হিসাবে বাকী পড়িয়াছে। তিনি তৎক্ষণাৎ স্বীকার হইলেন। বলিলেন—যদি আপনার মত সঙ্গী পাই তবে যথাসর্ব্বস্ব এই কার্য্যে ব্যয় করিতে প্রস্তুত আছি। বুঝিলাম তাঁহাকে হস্তগত করিয়াছি। তখনও তাঁহার নিদ্রা আসে নাই আসিবার সম্ভাবনাও ছিল না, তখন আমার পবিত্র ব্রতধারী, আমার জীবন সঙ্গীর একটু পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইলাম। নিকটে আসিয়া বলিলাম—নূতন স্থানে আসিয়া আপনার নিদ্রার ব্যাঘাত হইতেছে;

একটু জোয়াজ' করিলেই সুস্থ হইতে পারিবেন। আমার আর তখন ভয় কি? তিনিও পবিত্র আমিও পবিত্র। তাঁহার মস্তক নিজ অঙ্কে স্থাপন করিয়া কেশগুলির মধ্যে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে লাগিলাম। বলিলাম—যুবক বা যুবতীর মনের দৃঢ়তারও পরীক্ষা হওয়া আবশ্যক। প্যারিশ ছবিগুলির একটি ছবির প্রসঙ্গ তুলিয়া তাঁহার মানসপটে ভাবটি চিত্রিত করিয়া দিলাম, তিনি তৎক্ষণাৎ পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিলেন, আমি তাঁহার শোচনীয় অবস্থা অনুভব করিয়া মনে মনে হাসিতে লাগিলাম। আমরা পিশাচী, পৈশাচিক আনন্দই আমাদের আনন্দ। তাঁহাকে এই পর্য্যন্ত পাপের পথে এগাইয়া দিয়া, তাঁহারই অনতিদূরে শয্যা রচনা করিয়া শয়ন করিলাম।

পরদিন প্রভাতে কি দেখিলাম! একদিন পূর্ব্বে যিনি আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিলেন, যিনি কখনও কাহারও পাণিপীড়ন করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন, তিনিই একরাত্রির মধ্যে আমার পরম ভক্ত, অনুগত দাসে পরিণত হইয়াছেন। যে নারী সর্পবিদ্ধ অঙ্গুলির ন্যায় তাঁহার পরিত্যজ্য সেই নারী শিরোমণি আমি বারবিলাসিনা মানী, ওরফে মিস্ মুখার্জ্জি ভিন্ন তাঁর অন্ন রোচেনা। চা আসিল' বিস্কুট আসিল, নিষিদ্ধ পক্ষীর একযোড়া ডিম আসিল, কিন্তু তাঁহার মুগ্ধনেত্র আমার অনুসরণ করিতে লাগিল। আমি যাইয়া যখন চা পানে রত হইলাম, তখন তিনি শীতল চা-টুকু ঢোকে ঢোকে গিলিতে লাগিলেন।

বাড়ী ক্রয় করিবার জন্য দুইতিন মাসের মধ্যে বিশহাজার টাকা আমার হস্তগত হইল। আমার অঙ্গ মণি কাঞ্চননাদি নানা অলঙ্কারে ভূষিত হইল। অলঙ্কারে আমি আপত্তি করি-

লেও তাহা গ্রাহ্য হইল না। আমি একদিন তাঁহাকে বলিলাম— আমিই চিরকুমারী থাকিয়া ব্রত উদ্যাপন করিব, তিনি অনায়াসে সংসার আশ্রমে প্রবেশ করিতে পারেন। তিনি বলিলেন, আশ্রমের সেরূপ ওলট পালট করিতে আমাকে নাকি তাঁহার সঙ্গে যোগ দিতে হইবে। আমি তৎক্ষণাৎ দুই কর্ণে দুই হস্তের দু'টি অঙ্গুলি প্রদান করিতেই, অসাবধানতা বশতঃ তাঁহার সম্মুখে বে-আব্রু হইয়া পড়িলাম, তিনি উন্মত্তের মত আসিয়া আমাকে গভীর আলিঙ্গনে নিষ্পীড়িত করিয়া গণ্ড-দেশে এক-নিশ্বাসব্যাপী চুম্বন মুদ্রিত করিয়া দিলেন।

তারপরই একদিন সরাসরি বিবাহের প্রস্তাব। আমি বলিলাম এর কর্ত্তা আমি নই, দাদা-বাবু। দাদা-বাবু আসামীর সঙ্গে বাঙ্গালী শিক্ষিতা যুবতীর এরূপ মিলন অসম্ভব বলায়, আমার নবচন্দ্র প্রণয়ীটি কিল খাইয়া কিল চুরি করিয়া অদৃশ্য হইলেন।

কুমার গোপিকারমণ রায় উল্লিখিত জমিদার যুবকের নাকি বিশেষ বন্ধু, কুমার বাহাদুরের আলয়ে আমার হতাশ প্রণয়ী নিমন্ত্রিত হইতেন, শুনিয়াছি। কতদিন ইনি কুমার বাহাদুরের গৃহে আমা-কেও লইয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু আমি সে অনুরোধ রক্ষা করিতে পারি নাই। তবে কুমার বাহাদুরকে একদিনের জন্য আমার প্রণয়ীর মারফত, আমার কুটীরে পদধূলি প্রদানের জন্য অনুরোধ করিয়াছিলাম, কিন্তু জানিনা কি অপরাধে তিনি আমাকে কৃতার্থ করেন নাই। ঐ সময় আমি বেশ্যা বলিয়া পরিচিতা ছিলাম না। আমার এই বিচিত্র জীবনের আখ্যায়িকার কত কথাই লিখিলাম। মানুষ প্রবৃত্তির তাড়নায় কত ঘৃণিত কার্য্য করিতে পারে তাহাও দেখাইলাম। যাহা পবিত্র, মানুষ তাহাকে কলুষিত করিতে

বিশেষভাবে চেষ্টিত। সে মুখখানি আবরণ হীন, লোকে তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করেনা, যাহা আবৃত, যাহা পাপস্পর্শে মলিন হইয়া যায়, লোক তাহাতেই আকৃষ্ট। যে নারী প্রকাশ্যভাবে পুরুষের সঙ্গ কামনা করে, পুরুষ তাহা চায় না। অথচ যে কুলমহিলা পাপস্পর্শে সদা ভীত, পাপাত্মাগণ তাহাকেই পাপ পঙ্কে নিমজ্জিত করিতে চায়! হায়, আমার চিরকুমার ব্রতধারীর কি পরিণামই ঘটিল! কোথায় সেই ব্রত! কোথায় তার উদ্যাপন! এত স্বল্পদিনে নারী স্পর্শেই তাঁর দৃঢ় হৃদয় চূর্ণ হইয়া গেল, সঙ্কল্প বিকল্পে পরিণত হইল। তিনি ধন, মান, যশ হারাইয়াছেন, এত অল্পদিনেই আমার চরণে দাসখত লিখিয়া দিয়া ধন্য হইলেন। আমি কাহাকেও ক্ষমা করি নাই। সুন্দর রাজ অট্টালিকাবাসী ধনী মাড়োয়ারী মহলেও আমার বিশেষ কদর ছিল। তাহাদের কতক অর্থও আমার হস্তগত হইয়াছে। আমার উকীল দালাল একজন বিশিষ্ট মাড়োয়ারিকে আনিয়াছিলেন। সে আমাকে দেখিবামাত্র বলিল—বিবি সাহেব, স্বজাতীয় নাদাপেটী মাড়োয়ারী নারীতে কোনও শোভা নাই। বিদেশীয় আস্বাদেই পরমতৃপ্তি। সে আমাকে সোহাগ করিতে বলিত। আমি তাহাকে প্রাণেশ্বর বলিয়া একটী করিয়া গিনি সংগ্রহ করিয়াছি। একটী চুম্বনের মূল্যস্বরূপ দুটী গিনিও হস্তগত করিয়াছি। একদিন বাগান বাড়ীতে যাইয়া আমি ৩০০৲ টাকা আদায় করিয়াছিলাম। যাহারা হিন্দু-ধর্ম্মের এমন ধ্বজা উড়ায় তাহারা যে এমন কামান্ধ, পরদার পরায়ণ, তাহা আমার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল।

একাদশ

টি-পার্টি

ভবানীপুরে উঠিয়া আসিয়াছি পর হইতে আমি মিস্ মুখার্জ্জি নামেই পরিচিত। আমি এখন আর "মানদা" ফিরোজা বিবি" বা "মানী দিদি" নহি। প্রতিদিন আমি নূতন নূতন মতলব আঁটিতে লাগিলাম। আমার এই মতলবের মধ্যে টি-পার্টি ছিল প্রধান। আফিস ছুটীর পর আমার দালাল আসিতেন। যাঁহারা আসিতেন তাঁহারা ভাল মন্দ উভয় শ্রেণীরই ছিলেন। দুই এক ঘণ্টা আলাপ পরিচয়েই আমার প্রয়োজনীয় ব্যক্তিটীকে বাছিয়া লইতে পারিতাম। এভাবে যাঁহারা আসিতেন তাঁহাদের দ্বারা আমার তেমন ভাল আয় হইত না, বিশেষতঃ এদের জন্য ও খরচ হইত। বড়লোকের পকেটে হাত দিতে না পারিলে আমার ও দালাল দ্বয়ের কি করিয়া পোষাইবে।

একদিন ব্যারিষ্টার সাহেবকে বলিলাম, দেখ একটা কাজ কর। এই কলিকাতা সহরের বড় ব্যবসায়ী, বড় চাকুরে, ডেপুটী, মুন্সেফ, জমিদার, উকীল, ব্যারিষ্টার, স্কুলের শিক্ষক, প্রফেসার, দেশকর্ম্মী, সংস্কারক—এদের মধ্যে যাহাদের পকেটে বেশ টাকা আছে তাদের প্রত্যেক শ্রেণী হইতে পাঁচজন ক'রে নিমন্ত্রণ ক'রে একটা ভাল পার্টির বন্দোবস্ত কর দেখি।

ব্যারিষ্টার সাহেব দিন চারের মধ্যে একটা লিষ্ট করিয়া

আমাকে দেখাইলেন, লিষ্ট মধ্যে পূর্ব্ব জীবনের পরিচিত তিনটী ভদ্রলোকের নাম আমি ছাঁটিয়া দিলাম। তিনি নূতন নাম দ্বারা তাহা পূরণ করিলেন। এক রবিবারে এই পার্টির আয়োজন হইল। আমার নামে ছাপান নিমন্ত্রণ কার্ড দরোয়ান দ্বারা পাঠান হইল। স্কুলের শিক্ষক এই নিমন্ত্রণে একজনও আসেন নাই, মুনসেফ্ মাত্র একজন আসিয়াছিলেন, তিনি পার্টি শেষ হইবার পূর্ব্বেই চলিয়া যান। দেশকর্ম্মী এবং উকিল ও ব্যারিষ্টার প্রায় সকলেই আসিয়াছিলেন। অন্যান্যদের মধ্যেও প্রায় অনেকেই আসিয়াছিলেন। জলযোগের সামান্য বন্দোবস্ত ছিল—আর ছিল বিলাতী তরল পদার্থ। অবশ্য এ জিনিসটা সকলের মধ্যে পরিবেশিত হয় নাই। এই উপলক্ষে একটা ব্রহ্মসঙ্গীত এবং রবীন্দ্রনাথের চারিটী গান আমি গাহিয়াছিলাম। শ্রীযুক্ত প্রদীপ কুমার রায়ও কয়েকটি গান গাহিয়াছিলেন। একজন দেশকর্ম্মী একটা স্বদেশ-সঙ্গীত গাহিতে আমায় অনুরোধ করিলেন। আমি এই নূতন গানটি গাহিয়াছিলাম।

হাত দিয়ে তুই বাঁধ্‌লি হাত
প্রাণ দিয়ে প্রাণ বাঁধ্‌লি না;
এযে সোণা ফেলে দিলি গের
আঁচলে তা' বুঝ্‌লিনা।
তিরিশ কোটি বন্ধু পেলে,
জগত জয় অবহেলে
কর্‌তিস্ তা আর পার্‌লি না।

গান শেষ হইলে রাজনৈতিক তর্কবিতর্ক আরম্ভ হইল; একজন

কর্ম্মী পদ্ম সরকারের নিন্দা আরম্ভ করিলেন—তার নাকি কোথায় দুই একটা রক্ষিতা আছে, তাহার কথা, তাহার জাল জুয়াচুরির কথা তুলিয়া তাহাকে অত্যন্ত হেয় প্রতিপন্ন করিলেন। মিঃ ঘোষ ইহার প্রতিবাদ করিলে, অন্য এক দেশকর্ম্মী মিঃ ঘোষকে পর্য্যন্ত আক্রমণ করিতে ছাড়িলেন না। তিনি ইহাও বলিতে একটু ইতস্ততঃ করিলেন না যে, দেশবন্ধু এদের লাই দিয়ে বড় করে বড়ই ভুল করেছিলেন। দেশবন্ধু ভুল করিয়াছিলেন—এ কথাটাতে আমার প্রাণে যেন কেমন লাগিল, তখন আমিই ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলিলাম—দেশবন্ধু ভুল করিয়াছিলেন কি ঠিক করিয়াছিলেন তাহা তোমার আমার মত লোকের বুঝিবার শক্তি নাই—সে অগাধ সমুদ্রের তলস্পর্শ তোমার আমার মত লোকের কাজ নয়। তিনি কাহারও উপর কোন কার্য্য বিশেষের জন্য বিদ্বেষ বা প্রতিহিংসা পোষণ করিতেন না। তিনি লোক চিনিতে পারিতেন বলিয়াই এমন লোকও স্থান দিয়াছিলেন। যেমন—কুস্তিগির পালোয়ানকে আয়ত্ত করিতে হ'লে কুস্তিগির পালোয়ানের প্রয়োজন, তেমনি এই লোক দ্বারাও তিনি তার উপযুক্ত কাজ করাইবার জন্যই রাখিয়াছেন।

এর পরও তিনি জেদ ছাড়িলেন না, বলিলেন "এ যে বিশ্বাস-ঘাতক"—সেই প্রমাণ বোধ হয় দেশবন্ধু পান নাই। এখন তার মূর্ত্তি বাহির হইয়া গিয়াছে—মহারাজা ক্ষৌণিশের কাছে গোপনে দলের খবর এ লোকটাই দিত।...তারা দিদির প্রণয়ীর এ অপমানটাতে আমার মনটা যেন কেমন হইয়া গেল—প্রকাশ্যে বলিলাম—আচ্ছা আপনারা শ্লীলতার বাহিরে যান কেন?

বিশেষতঃ পদ্মবাবুর অসাক্ষাতে বলা কি ভাল! তার কথা না জানে কে, তাকে ত লোকে ঐ চক্ষুতেই দেখে। আজ যে পার্টিতে তাকে বলি নাই, কারণ, তাকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে জানিলে হয়ত অনেক বিশিষ্ট লোক নাও আসিতে পারেন।

এই ভদ্রলোকটী আবার বলিতে লাগিলেন— 'বীরেন শাসমল, জিতেন বানার্জ্জি এবং হেমন্ত সরকার কেন চলিয়া গিয়াছেন—তাহা কি আপনারা জানেন?" আমি তাঁকে আর বার্‌তে না দিয়া কোন প্রকারে থামাইয়া রাখিলাম।

মিঃ ঘোষ, ব্যারিষ্টার সাহেবের সঙ্গে অন্য ঘরে যাইয়া একটু টনিক খাইয়া আবার আসিলেন। তিনি বলিলেন—মিস্ মুখার্জ্জি —কিছু মনে করবেন না। সেদিন ঢাকার কাগজে দেখা গেল— কোন মেয়ে-বোর্ডিংএ আবর্জ্জনার স্তূপে এক মৃত শিশু পাওয়া গিয়াছে। ইহা লইয়া ঢাকায় মহা হুলস্থুল। আজকাল যে প্রকার অবাধ মেলামেশা চলিতেছে—ইহারই ফলে এ শিশু হত্যা নহে কি? ঢাকার এক ভদ্রলোক বলিলেন, একটা নহে—অনেক।

আমি বলিলাম—অবাধ মেলামেশা দোষের নহে—নিজকে বাঁচিয়ে চল্‌তে হয়। এই যে মেয়েগুলি আজকাল ছেলেদের সঙ্গে এক কলেজে পড়্‌ছে—দেখুন তাদের কেমন সুন্দর চাল চল্‌তি, যেন ঠিক ভাই বোন। প্রকৃতির যা নিয়ম—ভাই বোন এক সঙ্গে—এরা ঠিক তাই। আমি শিক্ষিতা উদার মিস্ মুখার্জ্জি, ইচ্ছার বিরুদ্ধেও আমাকে অবাধ মেলামেশা সমর্থন করিতে হইল। নইলে আমার মান থাকে কোথায়! অবাধ মেলামেশার জন্যই আজ আমি পতিতা।

মিঃ ঘোষ তখন বলিলেন—আপনি কি বলিতে চান যে—ঐ সব কলেজের ছেলেগুলি সব ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির! পূর্ণাঙ্গী মহিলাদের কাছে সমস্ত দিন ঘুরে ফিরেও এদের কোন ভাবান্তর উপস্থিত হয় না! আমি বলিলাম—সকলের কি আর এক রকম হ'তে পারে? উহাতে কাহারও যদি ভাবান্তর হয়—এবং তা'তে যদি একটা কিছু হয়ই—তবুও তেমন দোষ কি? স্বাধীন দেশে ত এমন কত হচ্ছে—তাতে কি আসে যায়!

মিষ্টার ঘোষ তখন বলিলেন—"তবে কি আপনি এ দেশটাকে ইংলণ্ড ও আমেরিকার ন্যায় দেখ্‌তে চান?" ইহার উত্তর কি দিব তাহা ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছিলাম না। এমন সময় মিঃ ঘোষ আবার বলিলেন—রুচীবাগীশ হেরম্ব বাবু নাকি "থিয়েটারের বাড়ী দেখাইয়া দেওয়া" ও পাপ মনে করেন, কারণ উহাতে যে সকল স্ত্রী-পুরুষ যাইয়া থাকে তাহাদের নাকি মনোবৃত্তি ভাল নহে; আজ তাঁ'র কলেজে যে সকল যুবক যুবতী একসঙ্গে পড়ে, তা'দের মনোবৃত্তি কেমন, তাহা যদি তিনি 'ব্যালটে' পরীক্ষা করেন, তবেই বুঝিতে পারিবেন। হেরম্ববাবু কি অবাধ মেলা-মেশার ফলে ঢাকার দুইটি ব্রাহ্ম পরিবারের বিবাহের ফল এবং তজ্জন্য এক পরিবারের পুনরায় হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণের বিষয় অবগত নহেন? রমলা গুপ্তা, লীলাবতী প্রভৃতি মোকদ্দমার বিষয় কি তিনি শুনেন নাই? রমলা গুপ্তা ত তাঁহাদেরই সমাজের লোক!

এ বিষয়ে আমি আর বাড়াবাড়ি পছন্দ করিতেছিলাম না—বিশেষতঃ রাত্রি অধিক হইয়াছিল। ক্রমে অনেকেই বিদায় গ্রহণ করিলেন, একটি খদ্দর পরিহিত যুবক রহিয়া গেলেন।

ইনি এখন কৌমার্য্য ব্রত পালন করিতেছেন—এর ও বাজারে যথেষ্ট-সুনাম আছে। ভাবিলাম, এদের মত কুমার এবং আমার মত কুমারীর সংখ্যা যদি এমন ভাবে বৃদ্ধি হয় তবে এদেশের কি শোচনীয় পরিণাম!

গার্ডেন পার্টি

আমি নিজে পতিতা—তা'র উপর আবার সাজিয়াছি ভদ্র-ঘরের কুমারী, এই প্রকার জুয়াচুরী আর ভাল লাগিতেছে না। আমার হাতে হাজার কয়েক টাকা জমিয়াছে। এ হীন পাপ বৃত্তি আর করিব না কল্পনা করিতে ছিলাম, কিন্তু আমার দালাল দুইজন ইহাতে অসুখী হন দেখিয়া অনেকটা ইচ্ছার বিরুদ্ধে লিপ্ত আছি।

দেহ বিক্রয় করিবার জন্য বার বার আমায় প্রলুব্ধ করিয়াছিল রাণীমাসী, সেজন্য তা'কে ততটা দোষ দেওয়া হয়ত চলেনা, কারণ উহাই ছিল তাহাব ব্যবসায়। কিন্তু আমার এই দালালদ্বয়, যাহারা ভদ্রলোকের ছেলে বলিয়া পরিচিত এবং উচ্চ শিক্ষার ডিগ্রিও যা'দের আছে, তা'দের এই প্রকার প্রবৃত্তির বিষয় যখন ভাবিতাম, তখন মনে হইত—হায় এ জগতের কি কল্যাণ আছে! যে জাতির মধ্যে উচ্চশিক্ষিত ভদ্রলোকের ছেলে বেশ্যার দালালি করে—দালালি করে কেন, বেশ্যাকে বেশ্যাবৃত্তি পরিত্যাগ করিতে দেখিলে তাহাকে ঐ পাপ বৃত্তি করিতে প্রলুব্ধ করে, তাহারাও ভদ্র এবং শিক্ষিত। আমি দেখিয়াছি, বারবনিতা সমাজেও কেহ এই বৃত্তি পরিত্যাগ করিতে চাহিলে, অনেক পতিতা তাহাকে সাধ্যমই

করিয়া থাকে, কিন্তু ভদ্র-নাম-ধারী লোকের একি প্রবৃত্তি! সেদিন রামবাগানের অবস্থাপন্ন পতিতা-নারী চুণী গলায় দড়ি দিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে; তাহার আত্মহত্যার কারণ সে এক চিঠিতে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছিল—"পতিতার জীবনে আমার ধিক্কার জন্মিয়াছে।" সে অন্যান্য পতিতাকেও এই বৃত্তি পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়া গিয়াছে। যে পাপবৃত্তি করিতে প্রাণ আর চাহে না, তাহাতে লিপ্ত থাকিতে যে কি কষ্ট, তাহা, কাহাকেও বুঝান যায় না। একদিন আমার উকিল দালালটি বলিলেন—দমদমায়... বাবুর বাগানে একটা পার্টি দিব ঠিক করিয়াছি। আমি বলিলাম —দমদমায় আর কেন, যদি দিতেই হয় তবে বাড়ীতেই দাও। তিনি শুনিলেন না, বাগানেই ভাল লোক আসেন, ইহাই বুঝাইয়া বাগানে পার্টির উদ্যোগ করিলেন। আমার নামে মুদ্রিত নিমন্ত্রণ পত্রও বিলি হইল, কিন্তু কাহারা যে নিমন্ত্রিত হইলেন সে খবর আমি লেই নাই। অনিচ্ছায় যে কাজ, তাহাতে তেমন উৎসাহ, উদ্দীপনা থাকে না। নির্দ্দিস্ট দিনে আমার নিজের মোটরে দমদমায় গেলাম। মোটর চালাইলেন খোদ ব্যারিষ্টার সাহেব। আমি তাঁর বামদিকে বসিয়াছিলাম, উকিল বাবু ছিলেন আমাদের পিছনে।

দমদমায় যাইয়া দেখি সেখানে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ২০।২৫ জন লোক বসিয়া আছেন। কয়েকটি খদ্দর পরিহিত যুবক নানা আয়োজনে ব্যস্ত। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—এরা কারা? উকিল বাবু বলিলেন, ইনি পার্টির খরচ দিচ্ছেন...বাবু, এরা তাঁহারই লোক। যিনি খরচ বহন করিতেছেন তাঁহারও খদ্দরের

জামা কাপড় এবং পায়ে স্যাণ্ডেল দেখিয়া মনে মনে বড় বিরক্ত হইলাম। কারণ নিন্দিত পল্লীতে থাকিতেও এই প্রকারের খদ্দর পরিহিত বহু যুবক, প্রৌঢ়ের সাক্ষাৎ ঘটিয়াছে, কিন্তু তাহাদের দ্বারা আয় হইয়াছে সামান্য। পুলিশগুলি যেমন ঐ সকল পল্লীতে তাহাদের পোষাকের দাপটে কাজ সারিয়া যায়, খদ্দর পরিহিত দেশকর্ম্মী ভলাণ্টিয়ার নামধারী অনেক যুবকও বলে —আমরা দেশের কাজে ব্রতী, পয়সা পাব কোথায়? অনেক কবি এবং সাহিত্যিকের দলও রিয়েলিষ্টিক আর্টের খোঁজে নিন্দিত পল্লীতে যাইয়া মার্জ্জিত কথা বলে, এবং বিনা খরচায় আর্টের স্বরূপ বুঝিতে চেষ্টা করে, সুতরাং আমার বিরক্ত হওয়াটা যে খুব অন্যায় হইয়াছে তাহা অন্ততঃ কোন ব্যবসায়ী লোক মনে করিবেন না।

সেদিন শিষ্টতার খাতিরে একটা গান গাহিলাম। আমার পরে অন্য দুই একজনও গান ধরিলেন। গান শেষ হইলে নারী নিগ্রহের কথা উঠিল—সকলেই ইহার জন্য তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিলেন। মন্তব্য প্রকাশের প্রধান কারণ মুসলমান সমাজের নীরবতা। একজন মুসলমান ভদ্রলোক ইহার প্রতিবাদ করিয়া যাহা বলিলেন, তাহার সারমর্ম্ম এই—হিন্দু নারীগণই মুসলমান-দের সঙ্গে যায়, ইহা মুসলমানদের দোষ নহে। মৌলবী আক্রাম খাঁ ও এই প্রকার কথাই তাঁহাদের আহুত প্রতিবাদ সভায় বলিয়াছিলেন। এই পার্টি যেদিন হইয়াছিল তাহার কয়েকদিন পূর্ব্বের কাগজেই ময়মনসিংহ সহরের ওভারসিয়ার শিক্ষিত মুসলমান আব্দুল রহিমের অবিবাহিতা কন্যা এবং কটিহাদি থানার

গোলাম সাহেবের স্ত্রীর নির্য্যাতনের খবর দেখাইয়া বলিলাম, "ইহারা কি হিন্দু ছিল—না—হিন্দু ইহাদের অপহরণ করিয়াছে! আক্রাম খাঁসাহেবকে একটু ভাবিয়া ইহার উত্তর দিতে বলিবেন কি? আব্দুল রহিম সাহেবের এই কন্যাকে উদ্ধার করিবার জন্য হিন্দুগণ যে প্রকার চেষ্টা করিয়াছিলেন তেমন প্রাণপণ চেষ্টা মুসলমানগণও করেন নাই। থানার দারোগা ঘোষাল মহাশয়ও হিন্দু, তিনি এজন্য আসমুদ্র হিমাচল মন্থনের আয়োজন করিয়াছিলেন। মৌলবী সাহেব এ বিষয়ে আর কোন জবাব দিতে না পারিয়া সৈনিক-কবি নজরুল ইছলমের বিবাহটা উল্লেখ করিয়া ফেলিলেন, এবং হিন্দুর দোষেই এ বিবাহটা হইয়াছে বলিলেন। তিনি আরও বলিলেন 'নজরুল কি মেয়ের ভাইএর নিকট এ প্রস্তাব নিয়া প্রথমে যাইতে সাহসী হইত যদি সে...আমি তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিলাম, যাহাদের কোন শাস্ত্রানুসারে বিবাহ হইয়াছে, তাহাদের কথা উল্লেখ করা উচিত নয়, আপনি এ বিষয়ে কোন কথা বলিবেন না। তিনি বেশ একটু রাগের ভাব দেখাইয়া চুপ করিতে বাধ্য হইলেন। আমি মনে মনে বলিলাম ইহা এক মাত্র অবাধ মেলা মেশার পরিণাম, যদি বিবাহটা আরও কিছু দিন টিকিয়া যায় তবে হয়ত বা পাকা হইলেও হইতে পারে।

এই মৌলবী সাহেবটি এমনই নির্লজ্জ যে আবার বলিতে লাগিলেন—আজকাল রাস্তা ঘাটে যে সকল হিন্দু-মেয়ে বে-আবরু চলা ফেরা করেন, তাঁহাদের অনেকের ডানদিকের অঙ্গ বিশেষের উপর ইচ্ছাপূর্ব্বক সাড়ী না দিবার কারণ কি? আমি লজ্জায় জিভ কাটিলাম। একথার কি উত্তর দিব। পতিতাগণও যে অঙ্গ রাস্তায়

চলিতে সাবধানে ঢাকিয়া চলে, আজকাল গৃহস্থ কুমারীও বিবাহিতা দিগের অনেকে উহা খোলা রাখা যেন ফ্যাসান মনে করেন। ইহার উত্তর নাই। বেশ একটু রুক্ষ মেজাজে তাঁহাকে বলিলাম—মহিলাদের সম্মান রাখিয়া যিনি কথা বলিতে পারেন না, তাঁহার কথা না বলাই উচিত।

আমার এই কথায় কয়েকজন বিশিষ্ট মুসলমান একসঙ্গে চলিয়া গেলেন, কিন্তু রহিলেন দুই এক জন। যিনি পার্টিদাতার অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং হিন্দু মুসলমান মিলনের বিশেষ কর্ম্মী বলিয়া আমার দালাল আমাকে তাঁহার নিকট পরিচয় করাইয়া দেন, তাঁহার মতলব আমার আর বুঝিতে বাকী রহিল না। আমি আমার দালালকে ঘৃণাভরে গোপনে বলিলাম; এ পাপবৃত্তি আজই শেষ, আর না। নিন্দিত পল্লীতেও যাহাদের গ্রহণ করি নাই আজ তুমি তাদের নিয়ে এসে হাজির! ধিক তোমাদের শিক্ষায়! দালালটি বলিল এ না হ'লে যে হিন্দু-মুসলমান মিলন হয় না, তাই এদের বাদ দিয়ে পার্টি দেওয়া ভাল নহে। তাহাদের প্রকাশ্যে কিছু বলিলাম না, লোকটার রুচি যেন মার্জ্জিত বলিয়াই মনে হইল।

এমন সময় কেহ কেহ সর্দ্দার বিলের বাদ প্রতিবাদ আরম্ভ করিলেন। আমার আর উহাতে যোগ দিবার ইচ্ছা ছিল না কিন্তু গায় পরে যখন আমার মতামত জানিতে চাহিল তখন আর কি করি! আমি যে শিক্ষিতা উদার নারীর আবরণে নিজেকে ঢাকিয়া কথা কহিতে ছিলাম, তাহা ভুলিয়া গেলাম। আমাদের পতিতা সমাজে যে হাজার হাজার কুমারী মেয়ে প্রথম যৌবন

উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে যৌনলিপ্সা চরিতার্থ করিতে না পারিয়া প্রবৃত্তির তাড়নায় হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া অবৈধ প্রেমে মজিয়া নিন্দিত পল্লীতে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছে—তাহাদের কথাই মনে হইল। মনে হইল যাহারা নিজেদের কলঙ্ক ঢাকিয়া রাখিতে পারে নাই তাহারাই ত এখানে আসিয়াছে, তাহারাত সমাজের অতি সামান্য অংশ মাত্র। এ প্রকার গুপ্ত প্রেম কয়টা ধরা পড়ে? হাজারে দু-একটা বইত নয়?

প্রকাশ্যে বলিলাম—প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে রজোদর্শনের সঙ্গে সঙ্গেই যখন মেয়েদের প্রবৃত্তি জাগরিত হয়, তখন ইহার পূর্ব্বেই বিবাহ দেওয়া উচিত। মৌলবী সাহেব বলিলেন—মিস্ মুখার্জ্জির মুখে এমন উত্তরের আশা আমরা করি নাই। আমি বলিলাম—আমি কেন—ঐ সেদিন যে নারীবাহিনী সর্দ্দার বিল সমর্থন করিতে টাউনহলে গিয়াছিল, তাহাদের যাইয়া গোপনে জিজ্ঞাসা করুন, তাহারাও আমার মতেরই প্রতিধ্বনি করিবে। আমি আর নিজেকে সামলাইতে পারিলাম না—ঢাকার ছাত্রী নিবাসের ভ্রূণহত্যা, দাস, গুহ পরিবারের অবৈধ বিবাহ প্রভৃতি কতকগুলি বড় ঘরের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া দিলাম। সৈয়দ হুসেনের সঙ্গে নেহরু কন্যার পালায়নের কথাটাও বলিয়া ফেলিলাম।

শাস্ত্র আমি জানি না, জানিতেও চাহি না, কিন্তু প্রাণে ক্ষুধা থাকিলে যদি সুধার পাত্র সম্মুখে পায় তবে এমন বীর নারী কয়জন আছে যে বৎসরের পর বৎসর তাহা গ্রহণ না করিয়া মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যায়? ইংলণ্ড, আমিরিকায় কি দেখিতেছি, সেখানে প্রতিশতে কুড়িটা ছাত্রী বিবাহের পূর্ব্বে সন্তান প্রসব

করে; ইহাতে তাহাদের সমাজচ্যুত হইতে হয় না। যদি ভারতকে তোমরা আমেরিকা করিতে চাও, তবে সে ভিন্ন কথা।

মৌলবী সাহেব তখন আলবার্ট হলে মেয়েদের সর্দ্দার বিবাহ বিল সমর্থনের কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন—এই সে দিন ২।৩ শত মহিলা আলবার্ট হলে মিলিত হইয়া "তালাক" আইনটাও পাশ করিতে অনুরোধ জানাইয়াছেন। এর উত্তর আমি আর কি বলিব ভাবিয়া উঠিতে পারিলাম না। হায় হিন্দুনারী, আজ তোমার এ কি মনোবৃত্তি! তোমারা যে দেখ্‌ছি সারা ভারতটাকে সোণাগাছিতে পরিণত করতে পারলে পরিতৃপ্ত হও। একবার কোন জবাব না দিয়া বলিলাম—চতুর্দ্দশ বৎসরের পূর্ব্বে কন্যার বিবাহ দিবার জন্য অভিভাবককে কেহ যখন বাধ্য করে না, যদি উহা অকল্যাণ মনে করেন, তখন দেশকে বুঝাইয়া সেই ব্যবস্থা করা উচিত। তাহা না করিয়া পুলিশের হাতে হিন্দুর যৌন ব্যাপার যাহারা দিতে চেষ্টা করিতেছেন তাহারা দেশের ঘোর শত্রু। বিশেষতঃ আমরা যখন শীঘ্রই স্বরাজ পাইতেছি, তখন এ কয়টা মাস সবুর করিলে কি চলে না?

সেইদিন হইতে আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম—এ পাপ ব্যবসায় আর করিব না। রিপু জয় করিতে পারি নাই বটে, চেষ্টা করিব। আমি এখন পাপ ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়াছি। আমার যে টাকা আছে তাহার দ্বারা আমার জীবনের অবশিষ্ট সময় চলিতে পারে। কবে মরিব ঠিক নাই—হয়ত আমার ধন আমার নিজ কার্য্যে ব্যয় না হইতেও পারে। দালালদ্বয় একটা উইল করিতে বলিলেন—আমি তাহাদের প্রস্তাবে স্বীকৃত হইয়া একটা খসড়া প্রস্তুত করিতে

বলিলাম। খসড়া পড়িয়া দেখিলাম—আমার মৃত্যুর পর তাঁহারা আমার ত্যজ্য সম্পত্তির উত্তরাধিকারী—এই প্রকার লিখিয়াছেন। আমি বলিলাম—তাহা হইতে পারে না—আমার মৃত্যুর পর—পতিত ও অন্ত্যজ জাতির সেবায় আমার ত্যজ্য সম্পত্তি ব্যয় করিতে হইবে। পতিতার ত্যজ্য সম্পত্তি গবর্ণমেণ্ট নিয়া যান—তাহাতে পতিতার ইচ্ছানুরূপ কোন কার্য্যই হয় না—এজন্য কলিকাতার কয়েকটি পতিতা মৃত্যুর পূর্ব্বে—হিন্দু-ধর্ম্মের যাঁহারা সংস্কারক এমন প্রতিষ্ঠানে দান করিয়া গিয়াছেন—আমিও তাহাই করিব স্থির করিয়াছি। হিন্দুসভা এবং হিন্দুমিশন, এই সকল কার্য্যে বিশেষ অগ্রণী।

সমাপ্ত

পুস্তকের শত শত অভিমত মধ্যে কয়েকখানি প্রদত্ত হইল।

গৌড়িয় বৈষ্ণব সম্মীলনীর সভাপতি হিন্দু সমাজের অন্যতম প্রধান নেতা প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় লিখিয়াছেন—পতিতার আত্মচরিত পাঠ করিলাম।......ঠিক সময় বুঝিয়া গ্রন্থখানি প্রকাশ করা হইয়াছে।......জননীর স্তন হইতে শিশু সন্তান দুগ্ধই গ্রহণ করিয়া থাকে কিন্তু জলৌকা বা জোঁক সেই স্তন হইতেই রুধির ভিন্ন আর কিছুই বাহির করিতে পারে না। এই আত্ম চরিত হইতেও লইতে পারিলে—লইবার মত অনেক জিনিস আছে; কিন্তু তাহা কি সকলে পারিবে?

বঙ্গের অদ্বিতীয় পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ তর্কতীর্থ মহাশয় বলেন—পতিতার আত্মচরিত পুস্তকখানা পাঠ করিয়া সন্তুষ্ট হইলাম। আধুনিক ধর্ম্ম বিপ্লব কালে এইরূপ পুস্তক দ্বারা হিন্দু সমাজের পক্ষে বিশেষ উপকার হইবে সন্দেহ নাই। সর্ব্বান্তকরণে উক্ত মানদাকে ধন্যবাদ দিতেছি। * * *

ঢাকার 'শান্তি' মাসিক পত্রিকার সম্পাদক ও বৈষ্ণব সমাজের অন্যতম নেতা সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও সমালোচক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দাস অগ্রহায়ণের শান্তি পত্রিকায় লিখিয়াছেন—

......বইখানির প্রতিপাদ্য বিষয় এই যে, মাথার উপর অভিভাবক না থাকিলে এবং সুযোগ ও সুবিধা পাইলে অল্প বিদ্যার মেয়েরা চলচ্চিত্রাদির মত তরল আমোদের দ্বারা এবং তরুণজাতীয় নাটক, নভেলের আলোচনা দ্বারা যে কি শোচনীয় পরিণাম ঘটিতে পারে তাহাই সাত্যকার জীবনের অভিজ্ঞতার দ্বারা আঁকিয়া দেখান। ......বইখানার বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে পাপকে attractive করিবার artistic প্রয়াস নাই। পতিতার জীবনের অনেক সুশোভন কাহ্যাই ইহাতে খোলাখুলি বর্ণনা আছে সত্য,

কিন্তু "মোপাশার" মত খামখা অশ্লীল চিত্রকে রঙ্গিন করিয়া তুলিবার প্রয়াস নাই......বিচার করিতে লইলে লেখিকার সংযত ভাষার প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। আলোচিত বইখানির সুর যে বর্ত্তমান তরুণ কথা সাহিত্যের অনেক বই হইতে স্বাস্থ্যকর, তাহা বোধ করি সাহস করিয়া বলা যায়। তাই আমরা সমাজের রুচিবাগীশ দিগকে বইখানা নিরপেক্ষভাবে পাঠ করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

'অমৃতবাজার পত্রিকা'—২৪শে নভেম্বর—It may be anticipated that the reading of the book may have a moral effect on the readers ..It contains nothing but some relveations of some evils which is persistent in the modern Hindu society at present—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট গ্রাজুয়েট বিভাগের অধ্যাপক মিঃ সৌগত সুগতকান্তি বলেন—Its each and every chapter contains good lessons for our young generations. I hope to see it translated in to all the Indian Vernacular as soon as possible— * * *

বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সভার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক, যাদবপুর বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইন্‌স্‌টিটিউটের অধ্যাপক ও Religious Instructor—

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম, এ, বি এল মহাশয় বলেন—

বর্ত্তমানে ছাগ-তান্ত্রিক সাহিত্যের প্রাবল্যের দিনে এ জাতীয় পুস্তকে না জানি কি বিভৎস দৃশ্যই চক্ষুতে পড়িবে, এই ভয় হইতেছিল কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় তাহার স্থলে সর্ব্বত্রই এক একটা করুণ ছবি দেখিতে পাইয়া একটা স্বস্তি অনুভব করিলাম; এবং গ্রন্থকর্ত্রী যে অতি সুকৌশলে এই সকল দৃশ্য সাধারণের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত করিয়া সাধারণের হৃদয়ে একটা সাবধানতার ভাব জাগরিত করিয়া দিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহাকে অশেষ ধন্যবাদ দিতেছি।

আজ যে আমাদের কি আধ্যাত্মিক কি শিক্ষা-নৈতিক কি রাজনৈতিক সকলদিকে নানারূপ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কোন সুফল ফলিতেছে না এই গ্রন্থে তাহার অনেকটা সমাধান করা হইয়াছে।

সিদ্ধি সত্যের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। দেশ ভণ্ডামির দ্বারা প্রতারিত হইয়া শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। খুব আশা করা যায় যে এই গ্রন্থপাঠে অনেক ভণ্ড আপনাদের স্বরূপ দর্শন করিয়া স্বীয় স্বীয় উপযুক্ত স্থান গ্রহণ করিবেন এবং জনসাধারণও নিজেদের ও আপন আপন আত্মীয়গণের পরিচালক নির্ব্বাচন করিবার পূর্ব্বে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিবেন।

এই পুস্তক দেশের লোকের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করিয়া দিয়া যে সমাজের কতদূর মহোপকার করিয়াছে তাহা বলা যায় না। এই গ্রন্থের বহুল প্রচার একান্ত প্রার্থনীয়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত অধ্যাপক মিঃ বি, এন, চক্রবর্ত্তী ডি, এস, সি ; পি, আর, এস্ মহাশয় বলেন—

'পতিতার 'আত্ম-চরিত' নামক পুস্তকখানি পড়িলাম। সম্পূর্ণ গ্রন্থখানি পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলাম ইহাতে সাধারণের নৈতিক অবনতিজনক কিছুই নাই। 'নোবেল' পুরস্কার প্রাপ্ত আনাতোল ফ্রাস, গুটহাম্ হুন্ প্রভৃতি পাশ্চাত্য সাহিত্যরথীগণের শত শত পুস্তকের মত ইহাতে অশ্লীলতা জ্ঞাপক কিছুই নাই। জনরব যে পুস্তকখানির প্রচলন বন্ধ করিবার চেষ্টা হইতেছে, কিন্তু নৈতিক জ্ঞান বলিতে আমরা যাহা বুঝি তাহাতে বলিতে পারি ইহার প্রচলন বন্ধ করিবার কিছুমাত্র হেতু নাই।

বাংলার অন্যতম জননায়ক, অধ্যাপক মনস্বী শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এল, সি মহাশয় বলেন—

'পতিতার আত্ম-চরিত এর সাহিত্যিক সম্পদ এবং ইহাতে যে সকল গূঢ় রহস্য প্রকাশ করা হইয়াছে তাহার মর্ম্ম না বুঝিয়াই পুস্তকখানিকে বাজেয়াপ্ত করাইবার জন্য কোন এক দল-বিশেষ উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন।

আমি বলিতে পারি বাজেয়াপ্ত করিবার বা সেরূপ কোন প্রকার গুরুতর প্রণালী অবলম্বন করিবার মত কিছুই এই পুস্তকে নাই, পক্ষান্তরে পুস্তকখানি অত্যন্ত সংযত ভাবে লেখা হইয়াছে এবং ইহা সম্পূর্ণরূপে অশ্লীলতা বর্জ্জিত।

ঘোরতর রুচি বিগর্হিত এবং চিত্ত চাঞ্চল্যকর কত পুস্তক যে প্রত্যহ ভারতবর্ষ এবং ইউরোপ হইতে প্রকাশিত হইতেছে কেহ তাহার খোঁজও রাখে না, অথচ কেন যে সাহিত্যের আসর হইতে এই বই খানিকেই সরাইয়া দিবার চেষ্টা হইতেছে তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট গ্রাজুয়েট বিভাগের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার ভূতপূর্ব্ব সদস্য শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার সরকার এম, এ, মহাশয় বলেন—

শ্রীমতী মানদা দেবীর 'পতিতার আত্ম-চরিত' নামক গ্রন্থখানি পড়িয়া সুখী হইলাম। বাস্তবিক সত্য ঘটনা যে উপন্যাসের কাহিনী অপেক্ষাও অদ্ভুত তাহা এই গ্রন্থ পাঠে উপলব্ধি হয়। আমাদের সমাজে নারীর অপরাধের ক্ষমা নাই, কিন্তু সমাজের নেতা পুরুষগণ লক্ষ পাপ করিয়াও নিজেরা মান সম্মানের সহিত অবাধে চলা ফেরা করিতেছেন। এই বৈষম্যের প্রতিকার অবিলম্বে হওয়া বাঞ্ছনীয়। অশ্লীলতা বর্জ্জন করিয়া এবং ব্যক্তিগত পরিচয় গোপন রাখিয়া যে সমস্ত বড় বড় লোকের কীর্ত্তি-কাহিনী প্রকাশ করা হইয়াছে, আশা করি তাহাতে সকলের চক্ষু ফুটিবে ও সমাজের মঙ্গল সাধিত হইবে।

গুরুকুল বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য বিভিন্ন কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক এবং 'ভারতের সাধনা' পত্রিকার সম্পাদক, সমাজ হিতৈষী শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ দত্ত, এম, এ, মহাশয় বলেন—বাংলা সাহিত্যে ইদানিং অনেক কিছু প্রবেশ করিয়াছে যাহা 'আর্ট'এর দোহাই দিয়া সাহিত্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে,—অনেক মহারথী ইহার চালক।......সমাজের বাস্তব চিত্র দর্শনে লোক শিক্ষার নিমিত্তই এই শ্রেণীর সাহিত্যের উপযোগীতা থাকিতে পারে। উপস্থিত পুস্তকে 'আর্টে'এর সেরূপ দোহাই নাই, সমাজের অতি শোচনীয় কতকগুলি প্রশ্নের সাক্ষাৎ দিগ্‌দর্শাইয়া প্রতিবিধানের চেষ্টা রহিয়াছে।...সমাজ শিক্ষার উপযোগীতা আছে।